জানুয়ারি-জুন, ২০১৩

নাগরিক উদ্যোগ

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

সংকটের আবর্তে গার্মেন্ট শিল্প: উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান

দর কষাকষি তত্ত্বের পেছনে লাশের মিছিল

ক্রমাগত গার্মেন্ট দুর্ঘটনা ও বিজিএমইএ'র দায়িত্বহীনতা

মানবাধিকার, তথ্য অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নাগরিক উদ্যোগ-এর কিছু প্রকাশনা

শিরোনাম	প্রকাশনার ধরন	লেখক/সম্পাদক	প্রকাশক	প্রকাশকাল/মূল্য
আমাদের তথ্য আমাদের অধিকার	অনুবাদ	আলতাফ পারভেজ মিজান আলী	নাগরিক উদ্যোগ ও সিএইচআরআই, ভারত	জুন ২০০৯ মূল্য: ১৫০
অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও শ্রমজীবী মানুষ	প্রবন্ধ সংকলন	ড. ফারজানা ইসলাম জাকির হোসেন অমিত রঞ্জন দে	নাগরিক উদ্যোগ ও পাওয়া	জুলাই ২০১০ মূল্য: ১০০
বাংলাদেশের দলিত ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী: চকিত জরিপ	সংকলন	আলতাফ পারভেজ রমেন বিশ্বাস	নাগরিক উদ্যোগ ও বিডিইআরএম	জুলাই ২০১০ মূল্য: ১০০
রাষ্ট্র, উদারীকরণ ও শ্রমজীবীদের সামাজিক নিরাপত্তা: বিপদের মুখে বাংলাদেশ	গবেষণা	আলতাফ পারভেজ	নাগরিক উদ্যোগ ও পাওয়া	সেপ্টেম্বর ২০০৮ মূল্য: ১০০
প্রতিবন্ধিত্ব: প্রেক্ষিত মানবাধিকার ও সেবার মান উন্নয়ন	গবেষণা	জাকির হোসেন ড. আলতাফ হোসেন	নাগরিক উদ্যোগ	জুন ২০১০ মূল্য: ১৫০
অস্পৃশ্যতা, দারিদ্র্য ও পুরুষতন্ত্র-বাংলাদেশে দলিত নারীর বিপন্নতা	গবেষণা	আলতাফ পারভেজ মাজহারুল ইসলাম মনি রানী দাস	নাগরিক উদ্যোগ	সেপ্টেম্বর ২০০৮ মূল্য: ৫০
প্রতিরোধ ও উন্নয়ন	সংকলন	আলতাফ পারভেজ	নাগরিক উদ্যোগ	এপ্রিল ২০০৭ মূল্য: ১০০
বাংলাদেশের নারী শ্রমজীবী	গবেষণা	আলতাফ পারভেজ	নাগরিক উদ্যোগ ও পাওয়া	মার্চ ২০০৭ মূল্য: ৯০
আম্বেদকর কেন বাংলাদেশে জরুরি	সংকলন	আলতাফ পারভেজ	নাগরিক উদ্যোগ ও বিডিইআরএম	নভেম্বর ২০০৮ মূল্য: ৫

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাড়ি নং-৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা
ফোন: ৮১১৫৮৬৮, ফ্যাক্স: ৯১৪১৫১১
ই-মেইল: info@nuhr.org
ওয়েবসাইট: www.nuhr.org

নাগরিক উদ্যোগ

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

জানুয়ারি-জুন, ২০১৩

সম্পাদক
জাকির হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
হোজ্জাতুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
আলতাফ পারভেজ
মাজহারুল ইসলাম
মাহাবুবা সুলতানা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
বারেক হোসেন (মিঠু)

প্রচ্ছদের ছবি
মারিয়ান ক্যামেনস্কাই, অস্ট্রিয়া
www.cartoonmovement.com

আলোকচিত্র
বারেক হোসেন (মিঠু) ও ইন্টারনেট

প্রকাশক
সম্পাদক কর্তৃক ৮/১৪, ব্লক-বি
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ থেকে
প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৮৬৮
ফ্যাক্স : ৯১৪১৫১১
ই-মেইল : nuddyog@gmail.com

মুদ্রণ
প্রকাশক কর্তৃক নূর কার্ড বোর্ড বক্স
ফ্যাক্টরি, ১৯/১, নীলক্ষেত বাবুপুরা
ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

দাম : ২০ টাকা।

সংকটের আবর্তে গার্মেন্ট শিল্প: উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান

৩

সস্তা শ্রম ও কোটা সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প ইতোমধ্যে বিশ্বের বড় বড় দেশে সম্প্রসারিত করেছে এর বাজার এবং পরিণত হয়েছে দেশের শ্রেষ্ঠ

রপ্তানিমুখী শিল্পে। তবে সাফল্য সত্ত্বেও ক্রমাগত শ্রমিক অসন্তোষ ও দুর্ঘটনায় শত শত শ্রমিকের প্রাণহানিতে পথভ্রষ্ট হচ্ছে এই শিল্প। এই শিল্পের চলমান সংকট উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান করেছেন ড. মিজানুর রহমান নাসিম ও মাজহারুল ইসলাম।

তিস্তার পানি নিয়ে অনিশ্চিত আলোচনা

২৯

আপাতদৃষ্টে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ককে বন্ধুপূর্ণ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেই

বন্ধুত্বে লাভবান হচ্ছে না বাংলাদেশ। অমীমাংসিত বহু সমস্যার কোনো ফলপ্রসু আলোচনা হচ্ছে না। যেমন এখনো ঝুলে আছে তিস্তা নদীর পানি বণ্টন সমস্যা। এ নিয়ে লিখেছেন গবেষক আলতাফ পারভেজ।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা

২৬

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিষয়ে সরকারি

অবস্থান ও ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়া জানাতে মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ ২০ মে, ২০১৩ তারিখে ঢাকায় একটি সংবাদ সম্মেলন করে। দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও ভূমিকা বুঝতে এই সংবাদ বিবৃতি গুরুত্বপূর্ণ।

আরো যা আছে

- ক্রমাগত গার্মেন্ট দুর্ঘটনা ও বিজিএমইএ'র দায়িত্বহীনতা ১২
  বিল্লাল খসরু
- শ্রমিক ও মালিক পক্ষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের যৌক্তিকতা নির্মাণ ১৬
  হোজ্জাতুল ইসলাম
- 'মেইড ইন বাংলাদেশ'-এর সস্তা টি-শার্ট: দর কষাকষি তত্ত্বের পেছনে লাশের মিছিল ১৯
  নূর-এ-জান্নাতুল ফেরদৌস রুহী
- পোশাক কারখানা নাকি মৃত্যুকূপ? ২২
  সুবীর দেওয়ান
- বাজার হারানোর শঙ্কা, ঘুরে দাঁড়ানোর এখনই সময় ২৪
  এ. এস. এম. সাদিকুর রহমান

স ম্পা দ কী য়

সম্পাদকীয়

পোশাক শিল্পের সংকট উত্তরণে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ প্রয়োজন

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা কাটছেই না। পোশাক কারখানাগুলোতে বারবার অগ্নিকাণ্ড ও ভবন ধসের ঘটনায় শত শত শ্রমিকের মৃত্যু, বেতন বাড়ানোর দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলন, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং কারখানা বন্ধ থাকার কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি দেশের পোশাক শিল্পের ইমেজ সংকট তীব্রতর হচ্ছে। বিশেষ করে গত এপ্রিলে সাভারের রানাপ্লাজায় ভবন ধসে সহস্রাধিক শ্রমিকের মৃত্যু এবং গত বছর তাজরীন ফ্যাশনস্-এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোকে বিশ্বের দরবারে শ্রমিকদের মৃত্যুকূপ হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার এবং বিশ্ব মিডিয়ায় এসবের ফলাও প্রচার কয়েক দশকে গড়ে ওঠা এ শিল্পের ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। আর কালক্ষেপণ না করে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এখনই আমাদের পোশাক শিল্পের সংকট নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে।

দেশের বর্তমান রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮০ ভাগই আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। গত কয়েক দশকে পোশাক শিল্পের এ অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে আমাদের দেশের সস্তা শ্রম বাজার। কিন্তু বাণিজ্যিক পরিপ্রেক্ষিতে সস্তা শ্রম একটি নিছক 'তুলনামূলক সুবিধা' মাত্র যা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। যে দেশেই যখন শ্রম সস্তা ছিল, সেখানেই তৈরি পোশাক শিল্প স্থানান্তরিত হয়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোও একসময় এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল। সময়ের সাথে সাথে যখন শ্রমের মূল্য বেড়ে যায়, পোশাক শিল্প তার পরবর্তী গন্তব্য খুঁজে নেয়। তাই তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য বাংলাদেশ বর্তমানে বেশ আকর্ষণীয় হলেও যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা না নিলে বিশ্ববাজারে এই অবস্থা ভবিষ্যতে ধরে রাখা কঠিন হবে।

পোশাক কারখানায় ভবন ধস বা অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিকের মৃত্যু, শ্রমিক অসন্তোষের জের ধরে ভাংচুর, শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ, শ্রমিক নেতা গুম ইত্যাদি বিষয় বাংলাদেশে এমন গতানুগতিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে যে এর পরবর্তী ছক বাধা পদক্ষেপগুলো আমাদের সকলেরই জানা- যেমন নাশকতার ষড়যন্ত্র খোঁজা, সংশ্লিষ্ট কারখানাকে বিজিএমইএ'র রেজিস্ট্রেশনের বহির্ভূত হিসেবে প্রমাণিত করার চেষ্টা এবং তদন্ত সাপেক্ষে দায়িদের যথাযথ শাস্তির মুখোমুখি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। দুর্ঘটনার পরপর পত্রিকাগুলোতে অনেক লেখালেখি হয়, দায়িদের কঠোর শাস্তি দাবি এবং বিভিন্ন নীতিমালা তৈরির সুপারিশ করা হয়, কিন্তু দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি থামে না। সুপারিশগুলো যৌক্তিক হলেও পোশাক শিল্পের স্বকীয় অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই সেগুলো বাস্তবায়ন করা যায় না। নীতিমালা তৈরি করলেও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয় না।

পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের কর্ম-পরিবেশের উন্নতি, যৌক্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, ফায়ার কোড ও অন্যান্য নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিত করতে হলে পোশাক কারখানার মালিক ও সরকারি নীতিনির্ধারকদের সমন্বয়ে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ পরিকল্পনা হতে হবে বাস্তবতা ও ন্যায্যতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে- আবেগ বা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া সুপারিশ বা পদক্ষেপ নয়। কারখানা মালিকদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সেসবের বাস্তবায়ন হবে না এবং সমস্যা আরো গভীর। একই সাথে শুধুই সস্তা শ্রমের প্রতি নির্ভরশীলতা কমিয়ে যতটা পারা যায় বিকল্প প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সুবিধা তৈরি ব্যবস্থা নিতে হবে, তবেই এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ভবিষ্যত প্রশস্ত হবে।

সংকটের আবর্তে গার্মেন্ট শিল্প: উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান

ড. মিজানুর রহমান নাসিম ও মাজহারুল ইসলাম

শুরুর কথা

৩০ বছর আগে অর্থাৎ আশির দশকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল হামাগুড়ি দিয়ে। কৈশোরের বাড়ন্ত সময়ে সস্তা শ্রম ও কোটা সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে এ শিল্প যৌবনে পদার্পণ করেছে। ইতোমধ্যে বিশ্বের বড় বড় দেশে সম্প্রসারিত করেছে এর বাজার এবং পরিণত হয়েছে বর্তমানে দেশের শ্রেষ্ঠ রপ্তানিমুখী শিল্পে। যৌবনের সবচে বড় গুণ তার অমিত তেজ। তবে সাফল্য সত্ত্বেও বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প পথভ্রষ্ট যুবকের মতোই হয়ে উঠেছে বিপদজনক। মালিকপক্ষের লোভমত্ত কর্মকাণ্ড আজ শতভাগ রপ্তানিমুখী এ শিল্পকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষ আজ উদ্বিগ্ন। কেননা, অগণিত শ্রমিকের জীবনীশক্তি নিংড়ানো কুশলী হাতের ছোঁয়ায় তৈরি নানা ফ্যাশনের পোশাকের অন্তরালে ক্রমশই জমা হচ্ছে শ্রমিকের রক্তের ছোপ।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে বিগত এক দশকে বেশ ক'টি ভয়াবহ দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম নিয়ামক রপ্তানিমুখী এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তাহীনতা এবং তাদের উপর মালিকপক্ষের নির্বিচার আগ্রাসন ও শোষণমূলক নীতি শিল্পযুগের উত্থানপর্বের নির্যাতন ও বঞ্চনাকেও হার মানাচ্ছে। আধুনিক শিল্পোন্নত পৃথিবীতে শ্রমিক অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের তাগাদা সত্ত্বেও মালিকপক্ষের 'থোড়াই কেয়ার নীতি'র ফলে বর্তমানে এ শিল্প পর্যবসিত হয়েছে ক্রীতদাসের শিল্পে। তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের প্রধান ও একমাত্র উৎস শ্রমিকের সস্তা শ্রমঘন উৎপাদন। একে কাজে লাগিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠছে মালিকপক্ষের পকেট। নামমাত্র মজুরিতে শ্রম প্রদানে বাধ্য করে আত্মসাৎ করা হচ্ছে ব্যাপক মুনাফা। আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি জীবনের নিরাপত্তাহীনতার মাঝে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে শ্রমিকদেরকে। ন্যূনতম নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় কারখানাগুলো পরিণত হয়েছে সাক্ষাৎ মৃত্যুকূপে। গ্রামীণ অর্থনীতির ভঙ্গুরতা, ব্যাপকসংখ্যক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বেকারত্বের ফলে ঐসব মানুষ জেনেশুনে ও খেয়ে পরে বেঁচে থাকার তাগিদে সেখানে শ্রম বিকোতে বাধ্য হচ্ছে। এ সুযোগে তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকেরা দিন দিন বেপোরোয়া হয়ে উঠছে। বিশেষ করে, ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে সাভারে রানাপ্লাজা নামক বহুতল ভবন ধসে সেখানে অবস্থিত ৫টি তৈরি পোশাক কারখানার সহস্রাধিক শ্রমিকের মৃত্যু এবং অগণিত মানুষের অঙ্গহানি-জখম হওয়ার শোকাবহ ঘটনাটি দেশের মানুষকে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে। এ ঘটনায় বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী যে প্রতিক্রিয়া ইতোমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে তাতে এই শিল্পকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে মালিকপক্ষের মানবিকতাবর্জিত শিল্পনীতির পরিবর্তন প্রয়োজন।

উত্থানপর্ব ও বিকাশ

বাংলাদেশে তৈরি পোশাকখাত গড়ে উঠেছে মূলত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রায় ৪০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান রয়েছে এই শিল্পে যার প্রায় ৩০ লাখই নারী। এই খাতের প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। বর্তমানে চীনের পর বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এই খাত থেকে প্রাপ্ত আয় মোট রপ্তানি আয়ের ৭৮ শতাংশ। পোশাক শিল্প শুধু দেশের অর্থনীতির চাকাই ঘুরিয়ে দেয় নি; বেকার সমস্যা লাঘবে রেখেছে অসামান্য অবদান। এরই সঙ্গে নিম্নবিত্ত সমাজের নির্যাতিত ও অবহেলিত অসংখ্য নারীর চোখে ফিরিয়ে দিয়েছে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। সাহস যুগিয়েছে আত্মনির্ভরশীল হয়ে সংসার নির্বাহের। বর্তমানে বার্ষিক ২ হাজার কোটি ডলার রপ্তানি আয়ের স্ফীতকায় এই শিল্প এখনও নানাভাবে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল।

তবে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল বেসরকারি খাতের উদ্যোগে। শিল্পোন্নত দেশ থেকে পঞ্চাশের দশকের দিকে পোশাক কারখানা মেক্সিকো হয়ে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে আসতে থাকে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে তা বাংলাদেশেও আসে। সস্তাশ্রম ও অতিরিক্ত শ্রমশক্তি থাকায় বাংলাদেশ খুব সহজে তখন এ সুযোগটি গ্রহণ করে এবং নানাবিধ অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা পায়। গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছেন পোশাক শিল্পের শ্রমিকেরা। ১৯৭৮-৭৯ অর্থ-বছরে এ শিল্পের রপ্তানি আয় ৪০ হাজার ডলার হলেও ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে তা প্রায় ২ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছেছে।

এ দেশের পোশাক খাতের উত্থানের দু'টি পর্যায় লক্ষণীয়– ১) শুরু থেকে ২০০৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোটা সুবিধার পর্ব ও ২) উন্মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতার পর্ব। অবশ্য শেষের পর্বটিতেই এ শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। ২০০৫ সালের পর দেশে পোশাক কারখানার সংখ্যা বেড়েছে ৩০%। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের পর কোটা উঠে গেলেও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) পায় বাংলাদেশ। সেইসাথে অন্যতম ক্রেতা কানাডার বাজারে পাচ্ছে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার। বর্তমানে এই খাতে ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৪ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়াত্ব আটটি ব্যাংকের বিনিয়োগ ১১ হাজার ৬৯১ কোটি টাকা এবং বেসরকারি ব্যাংকসহ বিদেশি ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ ২২ হাজার ৯৫২ কোটি টাকা।

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা

১৯৮২ সালে দেশে শিল্পনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়। এ সময় আমদানি বিকল্প থেকে সরে এসে বেসরকারি খাত নির্ভর রপ্তানিমুখী শিল্পকে প্রধান লক্ষ্য বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এর পরেই বড় ধরনের দুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর একটি হচ্ছে বন্ড সুবিধা যার মাধ্যমে পোশাক মালিকেরা বিনা শুল্কে পোশাক তৈরির সব ধরনের কাঁচামাল আমদানি করতে পারতেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এক হিসেবে দেখা যায়, ২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২ অর্থ-বছরের মোট ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকার বন্ড সুবিধা নিয়েছে তৈরি পোশাক কারখানার মালিকেরা। এই বন্ড সুবিধা না থাকলে তাদেরকে সমপরিমাণ অর্থ শুল্ক-কর হিসেবে দিতে হতো। এই সুবিধাটি অবশ্য পরবর্তীতে বিশেষায়িত বস্ত্র ও চামড়া খাতকেও দেওয়া হয়। অপরটি ১৯৮৬-৮৭ সালে দেয় ব্যাক টু ব্যাক এলসির ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সব ধরনের কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক পণ্য আনতে উদ্যোক্তাদের কোনো ধরনের অর্থের প্রয়োজন হয় না। পোশাক খাতের ব্যাপক অগ্রগতির পেছনে এ দুটি সহায়তার ভূমিকাই প্রধান বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে আরেকটি বড় প্রণোদনা দেয় সরকার। বস্ত্র ও পোশাক খাতকে এ সময় ২৫ শতাংশ নগদ সুবিধা দেওয়া হয়। পরে অবশ্য তা কমিয়ে ২০০২-০৩ অর্থবছরে ১৫ শতাংশ এবং বর্তমানে ৫ শতাংশ হারে নগদ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

সর্বোচ্চ কর সুবিধা

উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্প মালিকেরাই সবচেয়ে বেশি কর সুবিধা ভোগ করে থাকেন। ২০০৪-০৫ অর্থ-বছর থেকে তৈরি পোশাক খাতকে কোনো ধরনের মূল্য সংযোজন কর দিতে হয় না। রপ্তানির সময় উৎসে কর হিসেবে মাত্র ০.৮০ শতাংশ দিলেই সব ধরনের কর থেকে দায়মুক্তি পায় এসব প্রতিষ্ঠান। উৎসে করই চূড়ান্ত কর হিসেবে বিবেচিত হয়। বিগত দিনে এই করের হার বেশি থাকলেও মালিকপক্ষের চাপের কারণে সরকার তা কমাতে বাধ্য হয়। প্রতিবার মালিকপক্ষের অজুহাত আর যুক্তি থাকে যে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান তারা করছে এবং দেশের অর্থনীতিতে এ শিল্প অবদান রেখে চলছে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থেই সরকারের উচিত তাদের দাবিগুলো পূরণ করা। ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত এই খাত থেকে মাত্র ২৭৬ কোটি টাকা কর পেয়েছে রাজস্ব বোর্ড। অথচ প্রদত্ত করের চেয়ে সরকারের দেয় আর্থিক সহায়তার পাল্লাই ভারি। যেমন- ২০১১-১২ অর্থ-বছরে তারা কর দিয়েছে ৮৮৬ কোটি টাকা। বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে নগদ সহায়তা নিয়েছে ১ হাজার ৪১২ কোটি ৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা। গত অর্থ বছরের ১৯ মার্চ পর্যন্ত হিসেবে দেখা যায়, ১২৩ কোটি ২ লাখ টাকার নগদ সহায়তা নিয়েছেন বস্ত্র ও পোশাক খাতের মালিকেরা। এছাড়া গত অর্থ-বছরে ৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে পোশাক ও বস্ত্র খাতকে– যার এর এক তৃতীয়াংশ সহায়তাও পায় না দেশের অন্য কোনো রপ্তানিমুখী খাত। এর বাইরে গত তিন দশক থেকে তৈরি পোশাক খাতকে 'কর অবকাশ সুবিধা' (ট্রাক্স হলিডে) দিয়ে এই শিল্পকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ফ্যাক্টরির জন্য আনুষঙ্গিক উপকরণ আনতে মাত্র ৭% সুদে তারা ব্যাংক থেকে ঋণ পান। আবার শ্রমিকের মজুরির অর্থও দেয় ব্যাংক। যাবতীয় এসব সুবিধা নেয়া হলেও একে ব্যবহার করা হয় মালিকপক্ষের বিত্ত বাড়ানোর উপায় হিসেবে, সুবিধার ছিটেফোঁটাও পাতে পড়ে না কোনো শ্রমিকের।

সস্তাশ্রম ও অতিরিক্ত শ্রমশক্তি থাকায় বাংলাদেশ খুব সহজে তখন এ সুযোগটি গ্রহণ করে এবং নানাবিধ অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা পায়। গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছেন পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা।

ঋণ জালিয়াতি ও ঋণ মওকুফ

একমাত্র পোশাক খাতের খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে কোনো এককালীন জমা নেওয়া হয় না। কেবল তাই নয়, পোশাক খাতের ২৭০টি রুগ্ন শিল্পের আসল ঋণ ও সুদ মওকুফ এবং ঋণকে ব্লক করে রেখে নতুন সুবিধা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি অনুযায়ী, অধিকাংশ পোশাক মালিকের আয় সামান্য। তাদের দামি গাড়িগুলো প্রতিষ্ঠানের নামে– ফলে আয়করও দিতে হয় অনেক কম। এ ছাড়াও রয়েছে কর ফাঁকির নানা অভিযোগ। বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের স্বার্থে পোশাক খাত যা চায়, ঠিক তাইই পায়। অথচ দেশজুড়ে আলোচিত ব্যাপক অর্থ জালিয়াতি ও আর্থিক অনিয়মগুলো সংগঠিত হচ্ছে পোশাক খাতকে দেয়া সুযোগের অপব্যবহার করে। বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ আর্থিক কেলেঙ্কারির হোতা হলমার্ক গ্রুপও এভাবে অর্থ জালিয়াতি করেছে। সরকার পোশাক মালিকদের এসব সহায়তা দিচ্ছে জনগণের করের টাকায়। সুবিধাপ্রাপ্ত বিত্তশালী ঐসব মালিকেরা কী একবারও ভেবেছে, তারা যে সুবিধাগুলো পাচ্ছে, তা নিতান্তই জনগণ প্রদেয় করের অর্থ থেকেই সেটির সংস্থান হচ্ছে?

মুনাফা

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প এখন অন্যান্য শিল্পের তুলনায় অনেক বেশি লাভজনক। বর্তমানে অনেক তৈরি পোশাক শিল্প মালিক দেশের সর্বোচ্চ বিত্তবানের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। ৪ মে ২০১৩ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়, 'বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানায় অনেক মালিক পশ্চিমা ব্যবসায়ীদের মতো ধনাঢ্য। তাদের জীবনযাপনও বিলাসবহুল। কিন্তু নিজ কারখানার শ্রমিকদের অনেক কম মজুরি ও বেতন দেন তারা।' অনুসন্ধানে দেখা যায়, অধিকাংশ মালিকের অনেকের শুরুটা ছিল সামান্য পুঁজি দিয়ে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের। বাস্তবিকঅর্থে তৈরি পোশাক শিল্পে লাভের অংক এত বেশি যে মালিকপক্ষের অতিলোভের আকর্ষণে তা আজ এক শ্রমিক শোষণের যাঁতাকলে পরিণত হয়েছে। এই লাভের মূল উৎস দু'টি– ১. পানির দরে কেনা শ্রমিকের শ্রম ২. অনৈতিকভাবে সরকারি সুবিধা গ্রহণ ও কর ফাঁকি। ফলে পরিসংখ্যানে দেখা যায়, একটি ফাইভ পকেট জিন্স এর কাটিং এবং মেকিং চার্জ (সিএম) সর্বনিম্ন এক ডলার বা ৭৭ টাকা। নেট প্রফিট (সিএম এর উপর ১৫% লাভ) = ১১.৫৫ টাকা। একটি ৬৫ মেশিন স্ট্যান্ডার্ড লাইন এর দৈনিক উৎপাদন এক হাজার পিস হলে এর দৈনিক লাভ ১১.৫৫ X ১০০০=১১৫০০ টাকা। এ রকম ছোটো একটা ৮ লাইনের ফ্যাক্টরির দৈনিক লাভ ১১৫০০ X ৮ = ৯২,৪০০ টাকা। মাসিক লাভ ২৪,০২,৪০০ টাকা বা ২৪ লক্ষ টাকা যা বছরে ৩ কোটি টাকার কাছাকাছি। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ৮ লাইনের ফ্যাক্টরিকে ছোটো ফ্যাক্টরি ধরা হয়। এখন ৩০ বা ৪০ লাইন ফ্যাক্টরিকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়। এ লাভের অংকটা নানা শুভংকরের ফাঁক ফোঁকরে আরও ফুলে ফেঁপে ওঠে। ফলে লাভটা পকেটে পুরার জন্য প্রতিটি ফ্যাক্টরি ভয়াবহ রকম ওভারবুকিং দিয়ে থাকে। অর্ডার নেওয়ার সময় ৯০% ক্ষেত্রে কন্টিজেন্সি বা দুর্যোগ এর জন্য সময় হাতে রাখে না। ফলে হরতাল, আগুন, ভবনধস, অগণিত শ্রমিকের মৃত্যু কোনোকিছুই ফ্যাক্টরি চালুর বাধ্যবাধকতাকে রোধ করতে পারে না। ফলে এই লোভই হয়ে ওঠে দুর্ঘটনার বড় কারণ।

শ্রমিকের রক্ত পানি করা শ্রমের ন্যূনতম মূল্য পরিশোধ না করে তাদেরকে ঠকিয়ে এবং দেশের কর ফাঁকি দিয়ে বছরের পর বছর এবনরমাল প্রফিট করাটা শেষ পর্যন্ত এ শিল্পের মালিকদের বিবেককে সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দিয়েছে। তারা এমন এক মনোবিকারে চলে গেছে যে, শিপমেন্ট এবং প্রফিট– এ দুটো ছাড়া আর সবকিছুই তাদের কাছে অর্থহীন। মুনাফার অন্ধ আকর্ষণে সেখানে একজন ফ্যাক্টরির শ্রমিক হয়ে যায় ক্রীতদাসের চেয়ে অধম। মানুষ তার কাছে হয়ে যায় সংখ্যা মাত্র। বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রায় শতভাগ মালিক শহুরে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। তারা তাদের 'উঁচু শ্রেণী'র মানুষ হিসেবে অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। তাই তথাকথিত 'নিচু শ্রেণী'র অগণিত মানুষের মৃত্যু, হাসপাতালের বেডে অঙ্গহারাদের আর্তনাদ, স্বজনদের আহাজারি– কোনো কিছুই তাদের মনকে উদ্বেলিত করতে পারে না। তাই তো প্রতিটি দুর্ঘটনার পর তাদের প্রচেষ্টা থাকে কীভাবে দায় এড়ানো যায়। তাদের প্রতিশ্রুতি শুধু কথার বৃত্তে ঘোরপাক খায়। মালিকপক্ষের এরূপ আগ্রাসী ও নৈতিকতাবর্জিত অবস্থান অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প যে তার বিকাশের পথে হোঁচট খাবে এতে সন্দেহ নেই।

শ্রমিকের জন্য ব্যয় কত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয় কম। প্রভাবশালী টাইম ম্যাগাজিন সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছে, 'রানাপ্লাজার পোশাক কারখানাগুলোতে যারা কাজ করতেন, তাদের শ্রম অন্যের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। অথচ তারা এসব ঝুঁকি কমাতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয় নি।'

বাংলাদেশে একটি জিন্স শার্ট প্রস্তুত করতে যে খরচ হয়, যুক্তরাষ্ট্রে হয় তার প্রায় চার গুণ বেশি। আর বাংলাদেশে খরচ কম হওয়ার মূলে রয়েছে শ্রমিকের সস্তা মজুরি। ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল লেবার অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস হিসাব করে দেখিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে একটি জিন্স শার্ট প্রস্তুত করতে মোট খরচের অর্ধেকের বেশি ব্যয় হয় শ্রমিকের পেছনে। একই শার্ট বাংলাদেশে প্রস্তুত করতে মোট খরচের মাত্র ৬ শতাংশ ব্যয় হয় শ্রমিকের পেছনে। কিংবা ধরা যাক একটি পোলো শার্টের কথা। কানাডার পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ওররেক গ্রুপ ২০১১ সালে একটি হিসাব দিয়েছিল। তাতে দেখানো হয় যে, কানাডার খুচরা বিক্রেতারা বাংলাদেশে থেকে একটি পোলো শার্ট প্রস্তুত করাতে ব্যয় করে পাঁচ ডলার ৬৭ সেন্ট। আর তা বিক্রি করে ১৪ ডলারে। এই ১৪ ডলার বিক্রয়মূল্য দাম নির্ধারিত অন্তত ৬০ শতাংশ মুনাফা যোগ করে। আরও কিছু অপ্রকাশ্য ব্যয়ও এখানে যুক্ত হয়। অথচ প্রতিটি পোলো শার্টের জন্য বাংলাদেশি শ্রমিক পান মাত্র ১২ সেন্ট। যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন এইডের ২০০৭ সালের এপ্রিলের এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে এ রকম একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। এতে হিসাব দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশের তৈরি একটি টি-শার্ট যুক্তরাজ্যের সুপার মার্কেটে (অ্যাসডা বা টেসকো) যে খুচরা মূল্যে বিক্রি হয়, তার ৭০ শতাংশই যায় ওই সুপার মার্কেট বা আমদানিকারক ও বিক্রেতার পকেটে। রপ্তানিকারক পায় সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ। অবশিষ্ট ৩ শতাংশ হলো শ্রমিকের পাওনা।

> চার মাস পেরিয়ে গেলেও তাদের প্রতিশ্রুতি শুধু কথার বৃত্তে ঘোরপাক খাচ্ছে। মালিকপক্ষের এরূপ আগ্রাসী ও নৈতিকতাবর্জিত অবস্থান অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প যে তার বিকাশের পথে হোঁচট খাবে এতে সন্দেহ নেই।

মজুরি

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে কম মজুরিতে বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকেরা তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হন। সম্প্রতি ডব্লিউআরসি এক গবেষণায় দেখিয়েছে যে, ২০১২ সালেও যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। অবস্থান ভালো হলেও শ্রমিকদের মজুরি কমে গেছে ২ দশমিক ৩৭ শতাংশ। একই সময়ে চীনের মজুরি ১২৫ শতাংশ বেড়েছে। এখানে বাজার হারানো ও পাওয়ার সঙ্গে তাই সস্তা শ্রম ও মজুরির বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। আশির দশকে গড়ে উঠলেও ১৯৯৪ সালে প্রথমবারের মতো শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৯৬০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ২০০৬ সালে শ্রমিকদের প্রবল আন্দোলনের মুখে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরি দাবি করলেও শ্রমিকদের প্রবল আপত্তির মুখে মাত্র এক হাজার ৬৬২ টাকা মজুরি ঘোষণা করা হয়। তিন বছর পর আবার মজুরি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দুই মজুরি বোর্ডের মাঝখানে কয়েক দফা মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও মালিক বা সরকার পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। ফলে ২০১০ সালে শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২০১০ সালে তীব্র শ্রমিক অসন্তোষের পর সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি তিন হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। চীনে এই মজুরি বাংলাদেশের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি। ২০১০ সালের বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাক খাতের সবচেয়ে সস্তা শ্রমবাজার বাংলাদেশ। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার জ্যেষ্ঠ বেতন বিশেষজ্ঞ মাল্টে লুবকের বলেন, 'এই বেতন কমের মধ্যেও কম।' ফলে প্রতিদিন দুই ডলারের কম আয়ের এক মানবেতর জীবনযাপন করতে হয় পোশাক শ্রমিকদের।

ন্যূনতম মজুরির প্রস্তাব

সম্প্রতি তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সরকারকে ন্যূনতম মাসিক মজুরি বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ মজুরি প্রস্তাব করা হয়েছে ১৭ হাজার ৪৮০ টাকা। এ ছাড়া বছরে দুটি উৎসব ভাতা এবং যাতায়াত, হাজিরা বোনাস ও খাদ্য ভাতা প্রস্তাবিত মজুরির অতিরিক্ত হিসেবে দাবি করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বেতন কাঠামোতে সাতটি গ্রেডের কথা বলা হয়েছে– যাতে সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে বেতনভাতা ৮ হাজার ১১৪ টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে, কাজে যোগদানের তিন বছরের মধ্যে উচ্চতর গ্রেডে পদোন্নতি, মজুরির ১০ শতাংশ হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং শ্রম আইন অনুযায়ী গ্রাচুইটি সুবিধা নিশ্চিত করা। মজুরি বোর্ড জানায়, মালিকপক্ষের প্রস্তাব নেওয়ার পর দু'পক্ষের প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব শ্রম মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হবে।

প্রতারণার অপর নাম বীমা

শ্রমিকদের জন্য কারখানাগুলোতে রয়েছে ২০ জনের গ্রুপ বীমা। সেটিও সব কারখানা মেনে চলে না। কারখানায় যত শ্রমিকই থাকুক না কেন বীমা করা হয় মাত্র ২০ জনের নামে। তথাকথিত লোক দেখানো এই বীমা শ্রমিকদের প্রতি মালিকপক্ষের হেলাফেলার করুণ চিত্রকেই ফুটিয়ে তোলে। অথচ একের পর এক

দুর্ঘটনা ঘটে চললেও সরকার ও পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ তৈরি পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি এ ব্যাপারে নির্বিকার। ফলে রানা প্লাজা ভবনধসে ১ হাজার ১৩২ জনের মৃত্যু এবং অসংখ্য মানুষ অঙ্গহারা, আহত হলেও সেখানে অবস্থিত ৫টি কারখানায় কারখানাপ্রতি মাত্র ২০ জন করে বীমা করা ছিল মাত্র ১০০ জনের নামে। এর আগে তাজরীন ফ্যাশনস্-এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১১২ জনের মৃত্যু হলেও সেখানেও ওই ২০ জন।

অপরপক্ষে কারখানাগুলোর প্রায় যন্ত্রপাতিই বীমা করা ছিল। কারণ যন্ত্রপাতির বীমা ছাড়া ব্যাংক লোন পাওয়া যায় না। ফলে এ কথা বলা যায় যে, মালিকপক্ষের কাছে শ্রমিকের জীবনের মূল্যের চেয়ে যন্ত্রপাতির মূল্য অনেক বেশি। একে মালিকপক্ষের মানবিকতা বর্জিত মনোবিকার ছাড়া আর কী বলা যায়? সদ্য সংশোধিত শ্রম আইনে কোনো কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক থাকলে তাদের জন্য গ্রুপ বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সংশোধনের আগে তা ছিল ২০০ জনের ক্ষেত্রে। বীমা কোম্পানির মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের মতে, তাজরীন ফ্যাশনস-এ অগ্নিকাণ্ডের পর অল্প প্রিমিয়াম দিয়ে সব শ্রমিকের জন্য জীবনবীমা পলিসি বা দুর্ঘটনা পলিসি করতে তারা শ্রম মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করলেও তারা তা আমলে নেয় নি।

স্পেকট্রাম থেকে রানা প্লাজা : একের পর এক দুর্ঘটনা

২০০৫ সালের ১১ এপ্রিল সাভারের স্পেকট্রাম ভবনের শাহরিয়ার সোয়েটার্স কারখানার ৬৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে এবং ৮০ জন আহত হয়। ২০০৬ সালে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ফিনিক্স গার্মেন্টস কমপ্লেক্সের পাঁচতলা ভবন ধসে ২১ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পর স্পেকট্রামের মালিক শুধু দেড়মাস হাজত খাটে। কিন্তু কোনো সাজা দেয়া হয় নি। কারখানা পরিদর্শন ও তদারকির প্রতিশ্রুতিও একপর্যায়ে থেমে যায়।

আশুলিয়ার নরসিংহপুরে হামীম গ্রুপের একটি বহুতল পোশাক কারখানায় ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে এক দুপুরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় ২৯ জনের। এগারো তলা ওই ভবনের দশম তলায় আগুনের সূত্রপাত হলেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৯ ও ১১ তলায়। ফলে এ তিনটি তলা পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়। এক্ষেত্রেও ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়া ও নামকাওয়াস্তে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মালিক এ কে আজাদ তখন এফবিসিসিআই সভাপতি এবং দৈনিক সমকালের প্রকাশক। হেন ক্ষমতাবান ও বিত্তশালীকে কে ছোঁয়! ফলে ঘটনা আর এগুতে পারে না।

২০১২ সালের নভেম্বরে আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনস-এ আগুন লেগে ১১২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ওই কারখানার মালিক দেলোয়ার হোসেন তাৎক্ষণিকভাবে গিয়ে আশ্রয় নেয় বিজিএমইএ ভবনে। শুরু হয় তাকে রক্ষা করার জন্য প্রভাবশালীদের তৎপরতা। সরকারি তদন্ত কমিটি দেলোয়ার হোসেনকে দায়ী করলেও রহস্যজনক কারণে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি অনেক শ্রমিক।

তাজরীন দুর্ঘটনার পর কারখানা পরিদর্শন পরিদপ্তর থেকে দুই হাজার ৩৮১টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে প্রায় ৯০০ কারখানা পাওয়া যায় যারা শ্রম আইন, কারখানা আইন ও ইমারত আইন লঙ্ঘন করে কারখানা পরিচালনা করছে। দেখা যায়, এর মধ্যে প্রায় ৩০০ কারখানা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে। বিজিএমইএও সে সময় টাস্কফোর্স গঠন করে ভবন পরিদর্শনের কাজ শুরু করেছিল। সেই টাস্কফোর্সের আর কোনো খবর নেই।

ডেটলাইন ২৪ এপ্রিল ২০১৩ : রানা প্লাজা ধস

গত ২৪ এপ্রিল সকাল ৯টায় সাভার বাসস্টপের কাছে রানা প্লাজা নামক একটি নয়তলা ভবন বিকট শব্দে ধসে পড়ে। এর আগে কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে ঐ ভবনে অবস্থিত ৫টি তৈরি পোশাক কারখানার কর্মজীবীরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ঢুকে কাজে লেগে পড়ে। দুর্ঘটনার আগে ভবনটির কারখানাগুলোতে কর্মরত ছিল কয়েক হাজার শ্রমিক। ভবনের সঙ্গে ধসে পড়ে পাশের আর একটি ভবন। ভবনধসের একদিন আগে ঐ ভবনের ৩য় তলার কলামে ফাটল দেখা দেয়। স্থানীয় একজন প্রকৌশলী তা সরেজমিনে দেখে ভবনের ব্যবহার বন্ধ রেখে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণের সুপারিশ করে। ভবনের মালিকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঐ প্রকৌশলীর কথায় কর্ণপাত করে নি। তবে পরিস্থিতি আঁচ করে ঐ ভবনের নিচতলায় অবস্থিত ব্র্যাক ব্যাংক ঐ দিনই তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নেয় এবং কর্মচারীদের ছুটি দিয়ে দেয়। হরতালের

কারণে ঐদিন ভবনের বিপণি বিতানগুলো বন্ধ ছিল। পরের দিন যথারীতি কারখানা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভবনের মালিক সোহেল রানা বলেছিলেন, 'সামান্য একটু প্লাস্টার খসে পড়েছে।

এটা তেমন কিছু নয়।' যদিও ভবনের সেই সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি স্থানীয় সাংবাদিকদের দেখতে দেন নি। পোশাক কর্মীরা যখন এসব জানতে পারে তখন তারা ঐ ভবনে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু চাকুরিচ্যুতি, বেতন কর্তনসহ নানাবিধ হুমকি-ধামকি দিয়ে তাদের কাজে আসতে বাধ্য করা হয়। ২৪ এপ্রিল শ্রমিকেরা স্ব-স্ব কারখানায় কাজ শুরু করে। সকাল নয়টায় ভবনটি বিকট শব্দে ধসে পড়ে। পরবর্তী ইতিহাস সবারই জানা।

ভবনটির কাঠামোগত দুর্বলতা ছিল ভবনটি ধসে পড়ার প্রধান কারণ। রানা প্লাজার ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের গুণগত দিকটিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল তদারকি কর্তৃপক্ষ ছিল নির্বিকার। ফলে ধসের পর পরই ভবনের কংক্রিট গুঁড়া হয়ে মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়ে। ভূমিকম্প বা অন্য কোনো কারণে কোনো ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রাণহানি হ্রাসের মূলনীতি হলো, ভবনের ডিজাইন ও নির্মাণ এমন হতে হবে যেন ভবন ভেঙ্গে পড়ার সাথে সাথে পুরোপুরি বিধ্বস্ত না হয়ে কিছু সময় কাঠামোগতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এতে ভবনের ভেতর আটকে পড়া মানুষজন বেরিয়ে আসতে পারে। রানাপ্লাজা ধসের ক্ষেত্রে এমনটি পরিলক্ষিত হয় নি। তুলনামূলক সরু কলাম, নিম্নমানের কংক্রিট ও সেটেলমেন্ট ফেলিয়র একত্রিত হয়ে ভবনটি ধসে পড়ে মুহূর্তেই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে তো বটেই, এটি দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নির্মাণ ত্রুটি ও অবহেলার কারণে বিশ্বে ভবন ধসের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনায় পরিণত হয় রানা প্লাজা ধসের ঘটনাটি। এর মধ্য দিয়ে করুণ মৃত্যু ঘটে সহস্রাধিক শ্রমিকের। আহত হয় আরও সহস্রাধিক– যাদের বেশির ভাগই নারী। আগেভাগে বিপর্যয়ের আলামত দেখা সত্ত্বেও ডেকে এনে জোর করে ঝুঁকিপূর্ণ ঐ ভবনে শ্রমিকদের কাজে বাধ্য করানোর বিষয়টিকে গণহত্যা ছাড়া আর কী বলা যায়? লাশের মিছিল আরও দীর্ঘায়িত হতো যদি না আমাদের দেশের সামরিক বাহিনী, দমকল বাহিনীসহ অগণিত স্বেচ্ছাসেবী প্রাণের মায়া ত্যাগ করে উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তো। এর পরে, মাস না পেরোতেই রাজধানীর মিরপুরে তুং হাই নামক একটি সোয়েটার কারখানায় আবারও আগুনে পুড়ে কারখানার মালিকসহ ৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। সাভার ট্র্যাজেডিতে যখন সারাদেশ মূহ্যমান, তখনই ঘটলো এ দুর্ঘটনা। সঙ্গতই প্রশ্ন এসে যায়, এর শেষ কোথায়, এ হত্যালীলা কি চলতেই থাকবে?

ভবনের ডিজাইন ও নির্মাণ এমন হতে হবে যেন ভবন ভেঙ্গে পড়ার সাথে সাথে পুরোপুরি বিধ্বস্ত না হয়ে কিছু সময় কাঠামোগতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এতে ভবনের ভেতর আটকে পড়া মানুষজন বেরিয়ে আসতে পারে। রানাপ্লাজা ধসের ক্ষেত্রে এমনটি পরিলক্ষিত হয় নি।

রানা প্লাজা ধসের ফলাফল

রানাপ্লাজা ধসে আহত শ্রমিকের সংখ্যা শতাধিক। আহতদের অধিকাংশের বয়স ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। যে বয়সে উদ্যোম নিয়ে উপার্জন করার কথা ছিল। অথচ সেই বয়সেই তাদেরকে বরণ করতে হয়েছে পঙ্গুত্ব। আহতদের মধ্যে গুরুতর ৮১ জন। অনেককেই অঙ্গ হারিয়ে বরণ করতে হয়েছে পঙ্গুত্ব। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের মধ্যে বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি। কিন্তু সুস্থ হতে কতদিন লাগবে কেউ তা জানে না। পাশাপাশি রয়েছে ভবিষ্যত জীবনের অনিশ্চয়তাজনিত উদ্বেগের চাপ। পঙ্গুত্বের ভার বয়ে বাকি জীবনটি কীভাবে কাটাবেন, কী করে হবে পরিবারে অন্নসংস্থান, অবিবাহিত নারীদের সংসারজীবন জুটবে কি না, ভূমি ও বাস্তুহীন মানুষেরা কোথায় ঠাঁই পাবেন এসব নানাবিধ মানসিক উৎকণ্ঠায় তাদের অনেকেই ইতোমধ্যে মানসিক রোগে ভুগছেন। কেননা এরা অধিকাংশই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এদের পঙ্গুত্ব পুরো পরিবারটিকেই অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেবে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, শারীরিক পঙ্গুত্বের চেয়ে এই মানসিক হতাশাও উদ্বেগজনক। মোট কথা, সহস্রাধিক শ্রমিকের মৃত্যু, শারীরিক পঙ্গুত্ব বা মনোবৈকল্য সমাজে দীর্ঘ মেয়াদে নানামুখি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ক্ষতিপূরণ

ব্রিটিশ শাসনামলে অবহেলাজনিত চরম দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ বিষয়ক একটি আইন ১৮৫৫ সালে প্রণীত হয়। এ আইন অনুসারে এবং আইএলও ও বিশ্বব্যাংকেরও ক্ষতিপূরণ দেয়ার একটি গাণিতিক হিসাব আছে। এসব পদ্ধতির মধ্যে আমাদের দেশে কোনটি অনুসরণ করা হচ্ছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতোমধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দুই দফায় ২১৪ জন শ্রমিককে দুই লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত সকল ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন কি না এ বিষয়টি এখনও অনিশ্চিত। বরাবরের মতো ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা নিয়েও রয়েছে অস্পষ্টতা। আর বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে যে ক্ষতিপূরণের অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তার গড়িমসি দেখে খোদ সরকারও বিব্রত। অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, যে অঙ্কে (জনপ্রতি দুইলাখ টাকা) ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে তা যথোচিত নয়। ১৮৫৫ সালের আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলে জনপ্রতি প্রায় ৪৮ লাখ টাকা এবং আইএলও কিংবা বিশ্বব্যাংকের পদ্ধতি

অনুসরণ করলে প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত কমপক্ষে ৩০ লাখ টাকা পাবেন।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

রানাপ্লাজা ধসের ঘটনার পর ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে তিনমাসেরও বেশি সময়। কিন্তু এর রেশ কাটেনি। আহত ও নিহতের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি চলছে। নিখোঁজ সন্তান বা স্বজনের খোঁজে এখনও আশায় বুক বেঁধে ছুটাছুটি করছেন তার বাবা-মা বা আত্মীয়বর্গ। এসব পরিবারের দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই। এখনও ক্ষতিপূরণ পান নি অনেকেই। কিছু শ্রমিককে ভুল চিকিৎসায় পড়ে নানা শারীরিক ধকল পোহাতে হচ্ছে। অনেক শ্রমিককে অঙ্গ হারিয়ে আজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে। একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যের মৃত্যুর কারণে অনেক পরিবার সর্বশান্তে পরিণত হয়েছে, আরও অতলে তলিয়ে গেছে তাদের জীবনযাত্রার মান। দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

বিজিএমইএ এখন পর্যন্ত বেতন দিয়েছে দুই হাজার ৭৫৯ জন শ্রমিককে। অথচ তাদের হিসেবেই সেখানকার কারখানাগুলোতে মোট শ্রমিক ছিল তিন হাজার ৫৫৩ জন। মৃতদের মধ্যে ২৯১ জনকে চিহ্নিত করা যায় নি বলে তারা বেতন দেন নি। কিন্তু এর পরেও তাদের হিসেবেই আরও ৫০৩ জন শ্রমিককে এখনও ক্ষতিপূরণ তো দূরের কথা, বেতনই দেয়া হয় নি।

অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা ও হুমকির মুখে সরকার সকল ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি শ্রমিকদের স্বার্থে আইন সংশোধন এবং কারখানাগুলোতে কর্ম-পরিবেশ উন্নত করতে অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দেয়। কারখানা তদারকির জন্য লোকবল নিয়োগসহ নানা ধরনের পদক্ষেপের কথা বলা হয়। কিন্তু এখনও অনেক কিছু প্রতিশ্রুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিজিএমইএ দুর্ঘটনার পর পর কিছু তৎপরতা দেখালেও এখন অনেকটাই স্থিমিত। নেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ। বরাবরের মতো মালিক

পক্ষের এ সংগঠনটি লোকদেখানো তৎপরতা দিয়ে দুর্ঘটনাত্তোর উত্তেজনাকর পরিস্থিতিকে কৌশলে এড়িয়ে যায়। রানা প্লাজার মালিক এবং ওই ভবনে থাকা পোশাক কারখানার মালিকদের গ্রেপ্তার ও চারটি মামলা করা হয়েছিল। মামলার তদন্তের নামে চলছে কালক্ষেপণ। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, সত্যিই কি এবার এসব রাঘব-বোয়ালদের বিচার হবে, নাকি বরাবরের মতো বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদতে থাকবে রাজনৈতিক ক্ষমতা আর বিত্তের উন্মত্ততা দেখে?

বিদেশি ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে পোশাক কিনবে না ডিজনি

রানাপ্লাজাসহ সম্প্রতি মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সংগঠিত বেশক'টি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় নিহত কয়েক হাজার শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় আন্তর্জাতিক পোশাক বাজারের প্রভাবশালী কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের পোশাক আমদানি বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলোতে এসব ঘটনা ফলাও করে প্রচারিত হওয়ায় বিশ্বজুড়ে শ্রমিক সংগঠনসহ সচেতন নাগরিকেরা এ বিষয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন সাভারে ভবন ধসে প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। ভ্যাটিকনের পোপ ফ্রান্সিস ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা 'ক্রীতদাসের মতো'; আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কড়া সমালোচনাপূর্ণ লেখা।

অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক বিশ্বের বৃহত্তম বিনোদন প্রতিষ্ঠান ওয়াল্ট ডিজনি বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি ডিজনি কর্তৃপক্ষের এক চিঠিতে বলা হয়েছে, ডিজনির ব্যবসায়িক অংশীদারেরা যেসব দেশ থেকে তৈরি পোশাক কেনে সেই তালিকা থেকে গত মার্চেই বাংলাদেশের নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ডে শতাধিক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান এ সিদ্ধান্ত। সাভারের ট্রাজেডির পর বিশ্বজুড়ে গণ প্রতিবাদ ও ক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমা নামীদামী অন্যান্য কোম্পানিও ডিজনির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কানাডার লোবলোস কস (এল), জো ফ্রেশ এবং লন্ডনভিত্তিক প্রাইমার্ক ব্রান্ড সাভারে ধসে পড়া পোশাক কারখানায় তাদের পণ্য উৎপাদন করছিল। তারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশে কারখানার নিরাপত্তা কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন ও দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এদিকে বাণিজ্যিক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ইইউ'র পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান ও ট্রেড কমিশনার সম্প্রতি

এ যৌথ বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সংগঠিত সাভার ট্রাজেডির ভয়াবহতা ও ভবনটি নির্মাণে অনিয়মের বিষয়টি সারা বিশ্বে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করা হয়। ইইউ সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-পরিস্থিতির উন্নতি না করা হলে তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক ব্যবস্থা নেবে। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে চীন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, শ্রীলংকা ও তুরস্কে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে তুলনায় বাংলাদেশ থেকে পোশাক তৈরি করিয়ে নেওয়া লাভজনক। এছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে এক হাজারেরও বেশি পণ্য। তাই হয়তো শেষ পর্যন্ত অনেক ক্রেতা দেশই বাংলাদেশ থেকেই পণ্য তৈরি করে নিতে উৎসাহ বোধ করবে। কেননা, পশ্চিমা নামীদামী ব্রান্ডগুলো যে দামে বাংলাদেশের কাছ থেকে পণ্য কেনে এর চেয়ে অন্তত ১০ গুণ বেশি দামে বিক্রি করে। অন্যদিকে, পশ্চিমা ক্রেতারা মজুরি বাড়ানোর কথা বলে কিন্তু তারা বেশি দামে পণ্য কেনার ঘোষণা দেয় না। ফলে পোশাক শিল্পের দুর্ঘটনায় তাদের প্রতিক্রিয়া কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া আর কী! তবে ইউরোপ আমেরিকার অনেক নাগরিকই এ ঘটনায় রাজপথে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এবং পোপের প্রতিক্রিয়াকেও তারা গুরুত্বসহকারে নিয়েছে। তাদের অনেকেই এখন দোকানে গিয়ে পোশাক ক্রয়ের সময় কোথাকার তৈরি তা দেখে কিনছে।

দায় কার?

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রানা প্লাজার গণহত্যার ঘটনাটি দেশের পোশাক শিল্প ও সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে মন্দ প্রভাব ফেলবে। এর দায় কার? যে শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম পোশাক শিল্প আজ এতটা সমৃদ্ধ, সেই শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নে মালিকপক্ষের উদাসীনতা ও অবহেলার অভিযোগ অনেক পুরোনো। স্পেকট্রাম, তাজরীন ফ্যাশনস এবং সম্প্রতি রানা প্লাজার ভয়াবহ দুর্ঘটনা দেশবাসীর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কতটা দুঃসহ, কতটা অবহেলা এবং বঞ্চনার জীবন তাদের। গত এক দশকে সংগঠিত বেশ ক'টি দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় প্রমাণিত যে, কারখানাগুলোতে যথাযথ কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না করার জন্যই সহস্রাধিক শ্রমিককে এভাবে প্রাণ হারাতে হয়েছে। কারখানার অবকাঠামো ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায় মালিকের। পাশাপাশি সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের দায়িত্ব থাকে এগুলো নিয়মিত মনিটরিং করা। কিন্তু দেখা যায়, একটি দুর্ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পর কিছু তোড়জোড় শুরু হলেও পরে তা আর বাস্তবায়িত হয় না। অর্থের দাপটে প্রশাসন হয়ে ওঠে তাদের হাতের ক্রীড়নক, আইন হয়ে পড়ে অসহায়। খোদ বিজিএমইএ'র আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত বহুতল ভবনটিই এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আদালতের নির্দেশনা সত্ত্বেও এখনও ভবনটি ভাঙ্গা হয় নি। এছাড়া যখনই কোনো দুর্ঘটনা ঘটে বিজিএমইএ'র প্রভাবশালী নেতারা তৎপর হয়ে ওঠেন তাকে রক্ষার। একের পর এক বৈঠক করা হয়, সরকারপক্ষ এমনকি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সাথে গোপনে আঁতাত চলে। প্রায়শই বলা হয়, 'দুর্ঘটনা তো দুর্ঘটনাই। কেউই তো ইচ্ছে করে তো এসব করে না। এজন্য যদি শাস্তি দেয়া হয়– তাহলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এ শিল্পে, মালিকদের বিচার করা হলে বিদেশি ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নেবে' ইত্যাদি। মোট কথা ঘটনার সাথে নানা উপাখ্যান জুড়ে দিয়ে মূল কারণকে বরাবরই আড়াল করা হয়। অথচ কারখানার কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য এতটা সাংগঠিক উদ্যোগ কখনও নেওয়া হয় না। এসব দৃষ্টান্ত মালিকপক্ষকে তাদের কারখানাগুলো সংস্কার করতে অনুৎসাহিত করে। ফলে বিতর্কিত এসব ঘটনার জন্য বিজিএমইএ আজ মালিকপক্ষের স্বার্থরক্ষাকারী একটি বিতর্কিত সংস্থায় পরিণত হয়েছে। এটি সামগ্রিকভাবে এ শিল্প বিকাশের অন্তরায়। ২০১৩ সালের ২৭ এপ্রিল বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এম কে আনোয়ার বলেন, 'প্রতিটি সরকারই পোশাক শিল্প মালিকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হালকাভাবে দেখে। কোথাও তাদের অপরাধের সুষ্ঠু বিচার হয় নি। বিজিএমইএ-ও শক্তভাবে এগিয়ে আসে নি।' বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম বলেন, 'যদি তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ও স্পেকট্রাম কারখানায় ধসের পর মালিকদের বিচার হতো, তাহলে এ ধরনের ঘটনা আর ঘটতো না।' তবে তিনি রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় জড়িত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এবার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। 'সুশাসনের অভাব এবং নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ হলো সাভারের রানা প্লাজা ধস'– এমনটিই মনে করেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান। ঐ ঘটনার আরও কয়েকটি কারণ তিনি চিহ্নিত করেছেন যার মধ্যে আছে রাজনৈতিক চর্চা, শোচনীয় সামাজিক অবস্থা, জবাবদিহির অভাবসহ বৈশ্বিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক অবস্থাও।

সিডিএমপি রিপোর্ট

সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি)-এর সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ঢাকা শহরে প্রায় ৭৮ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রয়েছে যার মধ্যে ৬ হাজার ৫০০ ভবন অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ৬ হাজার ৫০০ ভবন যেকোনো সময় ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে। যদি সরকার এ ব্যাপারে সত্বর ফলপ্রসূ কোনো ব্যবস্থা না নেয় তাহলে এর জন্য অনেক মৃতের কফিন গুনতে হবে। এক কথায়, এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে ঢাকা শহর অচিরেই মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হবে। সিডিএমপি গবেষণা রিপোর্ট আরও দেখিয়েছে, রাজধানী ঢাকার ৫ হাজার আবাসিক ভবন ও অফিস ভবন পরিত্যক্ত অথবা ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। ঢাকা শহরের মাত্র ৩৫% দালান শক্ত ও কঠিন মাটির ভিত্তির উপর স্থাপিত; বাকি ৬৫% স্থাপনাই নরম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যেগুলো জলাভূমি ভরাট করে বা বালুময় কর্দমাক্ত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশাপাশি

এই দালানগুলো নির্মাণে যথাযথভাবে 'বিল্ডিং কোড' অনুসরণ করা হয় নি। যদি ঢাকা শহরে রিকটার স্কেলে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয় তবে উপরোক্ত ৭৮ হাজার দালানের মধ্যে অন্তত এক তৃতীয়াংশ বিধ্বস্ত হবে।

অন্যদিকে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের মতে, ঢাকার সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর, মিরপুর এবং নারায়ণগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ২৪৩ টির মতো তৈরি পোশাক কারখানা চূড়ান্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই দালানগুলো যেকোনো সময় ধসে পড়তে পারে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী আহমেদ খান স্বাক্ষরিত স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত এক রিপোর্টে এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সরকারের নিকট তুলে ধরা হয়।

এছাড়া, দেশে অনুমোদিত ২৮ হাজার কারখানা পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক আছেন ৪৬ জন। অর্থাৎ একজন পরিদর্শককে গড়ে ৬০৮টি কারখানা পরিদর্শন করতে হয়। কেবল রাজধানী ঢাকাতেই আছে ১৭ হাজার কারখানা। এটি বাংলাদেশ সরকরের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের তথ্য। রানা প্লাজা ধসের পর সরকারের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছিল, এ বছরের মধ্যেই কারখানা পরিদর্শকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো হবে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নও ২০০ পরিদর্শক নিয়োগের কথা বলেছে। এতো কিছুর পরও এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি নেই।

চার সদস্যের একটি শ্রমিক পরিবারের দৈনিক ন্যূনতম খরচ

এ পর্যালোচনায় আমরা ধরে নিচ্ছি, একজন শ্রমিক যিনি ৪ জনের এক পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করেন। আরো ধরে নেওয়া হচ্ছে এ শ্রমিক পরিবারটির কোনো বিনোদনের দরকার হয় না। তারা কোনো সিনেমা নাটক দেখেন না। তারা কোনোদিন দুর্যোগে পড়বেন না। তারা কোনো দিন মাংস বা ঐ জাতীয় দামি খাবার খাবেন না। আত্মীয়-স্বজন কারো কোনো দাওয়াতে যাবেন না তারা কারণ তা হলে উপহার কিনতে হবে তাদের। এও ধরে নেওয়া হচ্ছে, আলোচ্য পরিবারে শিশুরা স্কুলে যায় না কারণ তা হলে শিক্ষা খরচ প্রয়োজন হবে। এ জাতীয় সকল খরচাদি বাদ দিয়ে কেবল গবাদি পশুর মতো জীবনযাপনের জন্য একটি পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে একজন শ্রমিকের ন্যূনতম কত টাকা মজুরি প্রয়োজন সেটাই আমরা বিবেচনা করছি এখানে।

- চাল: দেড় কেজি করে ৩০ দিন = ৩০x৬০ (৪০ টাকা কেজি)	= ১৮০০ টাকা
- মাছ-তরকারি-তেল লবণ ইত্যাদি = দৈনিক ১০০ টাকা হিসেবে	= ৩০০০ টাকা
- স্বাস্থ্যসংক্রান্ত খরচ = মাসে জনপ্রতি গড়ে ২০০ করে = ২০০x৪	= ৮০০ টাকা
- বিদ্যুৎ-পানি-গ্যাস বিল (১০০০ টাকা) + বাড়ি ভাড়া (২০০০ টাকা)	= ৩০০০ টাকা
- পোশাক (জনপ্রতি মাসে গড়ে ১০০ টাকা)	= ৪০০ টাকা
- যাতায়াত (দিনে ২০ টাকা করে মাসে গড়)	= ৬০০ টাকা
ন্যূনতম মোট প্রয়োজন	= ৯,৬০০ টাকা

উৎস: আলতাফ পারভেজ, ফেসবুক পেজ।

শেষকথা

বিকাশমান এ শিল্পের সাথে আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের বিশেষ করে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অসহায় নারীদের জীবন-জীবিকা। একে কোনোভাবেই মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগী ব্যক্তির খামখেয়ালিপনা ও স্বেচ্ছাচারিতার কাছে জিম্মি রাখা যাবে না। শুধু বিদেশিদের সমালোচনা অথবা বাজার হারানোর ঝুঁকির ভয়ে নয়, আমাদের দেশের শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। দেশের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থেই শ্রমিকদের অধিকারগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। এটি দর-কষাকষির কোনো ব্যাপার নয়। সরকারের দায়িত্ব পোশাক খাতের সংস্কারের জন্য গুরুত্ব ও সামর্থ্য বিবেচনায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি উদ্যোগ নিতে হবে। অনতিবিলম্বে কিছু আশু পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। যেমন- শ্রমিক-মালিক সকল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইএলও-র কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮, সংবিধান প্রদত্ত ধারা অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা সুরক্ষা করার জন্য প্রচলিত শ্রম আইনের সংশোধন করতে হবে। স্বতন্ত্র স্থানে তৈরি পোশাক কারখানার ক্যাম্পাস গড়ে তোলা, ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাসমূহ বন্ধ ঘোষণা করা, কারখানা নিরাপত্তা বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শ্রমিকদের জন্য সম্মানজনক বেতনকাঠামো চালু করা, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও যথাযথ শাস্তিবিধান, ক্ষতিগ্রস্ত কর্মজীবীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের অন্যান্য কর্মজীবী নারীদের মতো পূর্ণ বেতনে ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান, সকল শ্রমিকের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা চালু, কারখানার গেটে অকারণে তালা লাগানো বন্ধ করা ও প্রতিটি কারখানায় একাধিক প্রশস্থ সিঁড়ির ব্যবস্থা করাসহ গুরুত্ব বিচারে সকল প্রয়োজনীয় সংস্কার কাম্য। দেশের অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে সোনার ডিমপাড়া হাঁসটিকে আমাদেরই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমরা কি সাভার ট্রাজেডির পরে আরও একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো, না এখনই যথাযথ পদক্ষেপ নিবো– এ প্রশ্নটি সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভেবে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করার কোনো সুযোগ নেই। স্যার ফজলে হোসেন আবেদের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়, 'মেড ইন বাংলাদেশ' হওয়া উচিৎ গর্বের প্রতীক, লজ্জার নয়।

ড. মিজানুর রহমান নাসিম: শিক্ষক ও সমাজ-সংস্কৃতি গবেষক।
mizanrah68@gmail.com

মাজহারুল ইসলাম: গবেষক ও মানবাধিকারকর্মী।
mazhar1971@yahoo.com

ক্রমাগত গার্মেন্ট দুর্ঘটনা ও বিজিএমইএ'র দায়িত্বহীনতা

বিল্লাল খসরু

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে ভবন ধস আর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অসংখ্য শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটেছে। আর আংশিক বা স্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন অগণিত মানুষ। অনেকে আবার এই প্রাণহরণের ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড বলেও অবহিত করেছেন। এই শিল্পে যখনই বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে বা শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হয় তখনই মালিকপক্ষের 'অভিভাবক' বিজিএমইএ ও সরকারকে তৎপর হতে দেখা যায়। গণমাধ্যম বিষয়টি ফলোআপের মধ্যে রাখার ফলে নিহত পরিবারের কিছুটা আর্থিক ক্ষতিপূরণ মেলে। কিন্তু যারা স্থায়ীভাবে অক্ষম হন, সময়ের ক্ষণে তারা হারিয়ে যান। অথচ 'দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে' কোনো কারখানার মালিকের বিরুদ্ধেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। স্পেকট্রামের মালিককে যদিও দেড় মাসের মতো জেলে আটক থাকতে হয়েছিল কিন্তু অপরাধের দায়ে তার কোনো সাজা হয়নি। সাধারণত এসব ঘটনার পর মামলা হয়, চার্জশীট তদন্তাধীন অবস্থায় থাকে কিন্তু আদালত বা আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে গিয়ে বিষয়টির সুরাহা হয় না।

পোশাক শিল্পে হাজার হাজার শ্রমিকের লাশের মিছিল

শ্রমিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করে বেসরকারি সংস্থা বিলস-এর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত ১১ বছরের পোশাক শিল্পে শুধুমাত্র অগ্নিকাণ্ডে ৭৩০ জন শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটেছে। এর মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যাটাই বেশি। গুরুতর আহত হয়েছেন চার হাজার ৭০০ জন। যদিও এর মধ্যে কতজন স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়েছেন তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। কেননা এ কাজটি নিরূপণ করার জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণিতে উল্লেখিত সীমিত পরিসংখ্যানে মূলত গণমাধ্যমে যেসকল দুর্ঘটনা তুলনামূলক বেশি আলোচিত হয়েছে সেগুলোর পরিসংখ্যানটাই তুলে ধরা হয়েছে। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো 'আহত' শ্রমিকদের সঠিক পরিসংখ্যান না পাওয়া। দুর্ঘটনার পর নিহতদের সংখ্যাটি তুলনামূলক বিবেচনায় নিলেই আহতদের সংখ্যাটি কী রকম হতে পারে তা হয়তো অনুধাবন করা সম্ভব।

অন্যদিকে রানা প্লাজায় নিহতের মধ্যে ২৯১টি মরদেহের পরিচয় সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এসব নিহতদের পরিচয় দাবি করেনি কোনো পরিবার। পোশাক শিল্পে এখনো শ্রমিক নিয়োগ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না পাওয়ার বড় প্রমাণ সর্বশেষ রানা প্লাজায় নিহতদের পরিচয়ের হদিস না পাওয়া। রানা প্লাজার মালিক পক্ষের কাছে এমন কোনো ডাটাবেজ ছিল না যে বা তারা প্রমাণ হাজির করতে সক্ষম হয়নি, দুর্ঘটনার দিন সেখানে মোট কত শ্রমিক কর্মরত ছিল এবং নিহত ও আহত অবস্থায় উদ্ধার হওয়ার পর মোট কত শ্রমিকের সন্ধান মেলেনি। যাদের হদিস মেলে নাই, তাদের পরিচয় সনাক্ত করার জন্য ডিএনএ টেস্টের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিয়োগের ডাটাবেজ বা হাজিরা খাতা থেকে সহজেই তা নির্ধারণ করা যেতো। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও যে মধ্যযুগীয় কায়দায় শ্রম আদায় করে নেয় রানা প্লাজার এই ধ্বস ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে থাকবে।

ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ মেলেনি

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ও অন্যান্য আর্থিক সহযোগিতা অনেক পরিবারই পায়নি বলে নিউইর্য়ক টাইমস তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক শ্রমিক সংস্থা সলিডারিটি ইউনিয়নের তথ্য অনুযায়ী প্রায় এক লাখ পরিবারকে এক লাখ থেকে চার লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট পরিবারগুলো ক্ষতিপূরণ বা কোনো আর্থিক সহযোগিতা পায়নি। যদিও নিজেদের লোকসান ঠেকানোর জন্য

এক নজরে কয়েকটি আলোচিত পোশাক কারখানায় দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান

সাল	প্রতিষ্ঠানের নাম	দুর্ঘটনার ধরন	নিহত	আহত	গৃহীত আইনি ব্যবস্থা
২০০৫ সাল ১১ মে	স্পেকট্রাম সোয়েটার্স, বাইপাল, সাভার	ভবন ধস	৬১ জন। তবে এ সময়ে লাশ গুমেরও অভিযোগ ছিল।	উল্লেখ নাই	মালিক শাহারিয়ারের কোনো সাজা হয়নি। দেড় মাস জেল হাজতে ছিল। মামলার অগ্রগতি নাই।
২০০৬ ডিসেম্বর	ফিনিক্স গার্মেন্টস কমপ্লেক্স, তেজগাঁও	ভবন ধস	২১	উল্লেখ নাই	কোনো আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি
২০১০, ১৪ ডিসেম্বর	হামীম গ্রুপ, আশুলিয়া	অগ্নিকাণ্ড	২৮	১০০ জন	কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই।
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০	গরীব এন্ড গরীব	অগ্নিকাণ্ড	২১ জন	উল্লেখ নাই	মামলা হয়। কিন্তু অগ্রগতি নাই
২০১২, নভেম্বর	তাজরীন ফ্যাশনস, আশুলিয়া	অগ্নিকাণ্ড	১১২	উল্লেখ নাই	মালিক দেলোয়ার হোসেনের কোনো সাজা হয়নি। সরকারি তদন্ত কমিটি তাকে দোষী সাব্যস্ত করলেও আইন কোনো গৃহীত হয়নি।
২০১৩, ২৪ এপ্রিল	রানা প্লাজা, সাভার	ভবন ধস	১১৩২	আহত সহস্রাধিক। এরমধ্যে অসংখ্য স্থায়ীভাবে অক্ষম রয়েছে।	রানা প্লাজায় পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২ জন মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।
২০১৩, ২৬ জানুয়ারি,	স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেড, মোহাম্মদপুর ঢাকা	অগ্নিকাণ্ড	৭	উল্লেখ নাই	কারখানার চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপককে সাময়িকভাবে গ্রেফতার করা হয়।
মোট			১৩৯৩		

বিজিএমইএকে যতটা সোচ্চার হতে দেখা যায়; শ্রমিকের এই ক্ষতিপূরণ না মেলা, অনিয়ম বা দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়টি দেখভাল বা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে বিজিএমএই'র ভূমিকা ছিল কার্যত নিষ্ক্রিয়।

রানা প্লাজায় এই ভয়াবহ জীবনহানির পর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা নিহত ও গুরুতর আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সময়ের সাথে সাথে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপও ফিকে হতে শুরু করে। বাংলাদেশের এই শিল্পের মানোন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নির্মাণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও শ্রম মন্ত্রণালয় পৃথক পৃথকভাবে কাজ করছে। একই সাথে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমবান্ধব কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। রানা প্লাজা ধ্বসের পর এই বড় বড় ক্রেতাদের কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রতিশ্রুতির কোনো বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। পোশাক মালিকদের 'অভিভাবক' বিজিএমইএকে এ বিষয়ে খুব একটা সোচ্চার হতে দেখা যায় না। ক্রেতাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য এই সংগঠনটির ভূমিকা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। নিজেদের মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য কর কমানো ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য এই সংগঠনটি সরকার ও গণমাধ্যমের সামনে যতটা জোরালো বক্তব্য রাখে তার কিছুটাই দেখা যায় না শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার বেলায়।

তাজরীন গার্মেন্টেসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাত লাখ টাকা করে দেওয়া হয়। তাও সেখানে প্রতিজনের বিপরীতে বিজিএমইএ'র ক্ষতিপূরণ ছিল মাত্র এক লাখ টাকা। আর তাজরীন মালিকের একটি টাকাও ক্ষতিপূরণ দিতে হয়নি। এ অগ্নিকাণ্ডের পর প্রায় একবছর অতিবাহিত হলেও নিহত ১১২টি পরিবারের মধ্যে ১৩টি পরিবার আজও কোনো ক্ষতিপূরণ পায়নি।

কারখানাগুলোতে শ্রমিকের জীবনের বীমা নেই

শ্রম আইনের ৯৯ ধারায় বলা আছে কোনো প্রতিষ্ঠানে ২০০ জনের অধিক শ্রমিক থাকলে তা বীমা করতে হবে। অথচ পোশাক কারখানার মালিকদের এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। বিজিএমএইএ এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেয় না। কারাখানা মালিকরা শ্রমিকদের জীবন বীমা করার বিষয়ে কতটা উদাসীন তার উদাহরণ মেলে রানা প্লাজায় কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বীমার চিত্র দেখলে। বিজিএমইএ'র সূত্রে দুর্ঘটনার দিন রানা প্লাজায় কর্মরত মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৪০০ জন। কিন্তু এর মধ্যে

বীমা করা ছিল মাত্র ১০০ জন শ্রমিকের। গ্রুপ বীমা করার ক্ষেত্রে মালিকপক্ষের গাফলতি আর বিজিএমইএ'র দায়িত্বহীনতার বিষয়টি শ্রম সচিব মিখাইল শিপারের বক্তব্যে উঠে আসে। গণমাধ্যমে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, 'গ্রুপ বীমা করার ক্ষেত্রে কারখানাগুলো শ্রম আইন মানছে না। এ জন্য বিজিএমইএ দায়ী'। অন্যদিকে গ্রুপ বীমা করার বিষয়টি শ্রম আইনে বলা থাকলেও মালিকপক্ষ তা পালন না করলে এর বিরুদ্ধে কী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা এ আইনে উল্লেখ নেই। ফলে মালিকপক্ষ আইনের জন্য শ্রমিকের বীমার বিষয়টি বরাবরই এড়িয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ দাবির পর সম্প্রতি শ্রম আইন দ্বিতীয়বারের সংশোধন করা হয়। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন চাপে প্রণীত এই আইনের সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য দিক হলো শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার রাখা হয়েছে। এছাড়া শ্রমিক স্বার্থ সমুন্নত করার জন্যে বীমা সুবিধা, ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্যসেবা, প্রসবকালীন ছুটি, কারখানার নিরাপত্তা, ভবনের নকশা ইত্যাদি এই আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে দরকষাকষির যে প্রক্রিয়া সেই ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একই প্রতিষ্ঠানের কর্মরত ৩০ শতাংশ শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তি বিষয়টিকে জটিল করে দিয়েছে। বাংলাদেশে এই শিল্পে এখনও সেই সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। এভাবে আইনে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার বিধান আর তা অনেকটা উপনিবেশিক কায়দায় শ্রমিকদের সংগঠন করার চর্চার মধ্যে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা হয়তো অদূর ভবিষতে দেখা যাবে।

দুর্ঘটনা তদন্তের কোনো ফল পাওয়া যায় না

তাজরীনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড নিছক দুর্ঘটনা নয়, এটি নাশকতার একটি অংশ। পাশাপাশি মালিকপক্ষের অবহেলাকেও দায়ী করা হয়। একই সাথে মালিকের অবহেলাকে দায়ী করে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালতে মামলা দায়েরের সুপারিশ করে। এছাড়া শ্রম মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে তাজরীন গার্মেন্টেস-এর মালিকের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগে শ্রম আইনে মামলার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু ঘটনার কয়েক মাস পরেও তাজরীনের মালিককে আইনি প্রক্রিয়ায় এনে বিচারের মুখোমুখি করার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা বিজিএমইএ'র এই 'নাশকতার গল্পকে' আমলে নিয়ে এই ধরনের ষড়যন্ত্রকারী শক্তিকে চিহ্নিত করা এবং আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ নাশকতা বা নিরাপত্তার ঝুঁকির ক্ষেত্রে শ্রমিকের জীবন রক্ষায় ব্যর্থতার দায় পোশাক শিল্পের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সরকারের ওপর বর্তায়। উল্লেখ্য, ১৭ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া প্রতিবেদনে তদন্ত কমিটি নয়জনকে দুর্ঘটনা ও হতাহতের জন্য দায়ী করে। এদের মধ্যে এখন পর্যন্ত দু'জন গ্রেফতার হয়েছেন। ঘটনার পরের দিন পুলিশের করা মামলার এজাহারে দণ্ডবিধির ৩০৪(ক)-এর ধারায় (অবহেলার জন্য মৃত্যু সংঘটনের) অভিযোগ আনা হয়েছে। গত জানুয়ারি থেকে মামলাটি তদন্ত করছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি। উল্লেখ্য, অতীতে এই ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনগুলো কখনও প্রকাশিত হয়েছে আবার কখনও তা আলোর মুখ দেখেনি। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৫ সাল থেকে ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানায় অগ্নিসংযোগের কারণে প্রায় ৭০০ জনের প্রাণহানি ঘটে। একটি ঘটনার জন্যও দায়ী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়নি। শ্রমিকদের সম্ভাব্য বিক্ষোভ মোকাবেলার জন্য আলাদা পুলিশ বাহিনী গঠন করা হলেও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও শ্রমিক স্বার্থ সুরক্ষা করার জন্য ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর, কারখানায় আগুন বা দুর্ঘটনা মোকাবেলা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য জনবল ও বরাদ্দের অপ্রতুলতা থেকেই যাচ্ছে।

যতই প্রাণহানি ঘটুক দায় নিতে নারাজ বিজিএমএই

রানা প্লাজার ঘটনায় বিজিএমইএ'র কী দায়- সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে বিজিএমইএ সভাপতি দায় নেই বলে জানান। ভবন ধ্বসের আগের দিন রানা প্লাজায় সমিতির পক্ষ থেকে দুজন পোশাকমলিকদের কারখানা বন্ধ রাখার জন্য বলে এবং প্রকৌশলীদের দিয়ে ভবন পরীক্ষা করা হয়। তবে এই তথ্যের সমর্থনে সমিতির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে কোনো নথিপত্র হাজির করা হয়নি। অন্যদিকে বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রকৌশলীদের পর্যবেক্ষণ থেকে বিজিএমইএ'র ভূমিকা কী ছিল তাও জানা সম্ভব হয়নি।

রানা প্লাজা ধ্বসের পর বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে একটি তদন্ত করা হয়। তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার ১০ দিন পর প্রতিবেদন দেওয়ার কথা থাকলেও প্রায় দুই মাস পর দায়সাড়া একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে বিজিএমইএ। এই প্রতিবেদনে রানা প্লাজার মালিককে দায়ী করা হয়। ভবনের মালিকসহ ভবন অনুমোদনের সাথে জড়িত পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, নকশা অনুমোদনকারী কর্মকর্তা, রাজউক, কলকারখানার অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও প্রকৌশলীকে দায়ী করা হয়েছে। ভবনে পাঁচটি কারখানার মালিকদের অবহেলায় মৃত্যুর অভিযোগ এনে ৩০৪ ধারায় ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়। রানা প্লাজা নির্মাণে নকশা ও কারিগরি যেসকল গুরুতর অনিয়ম করা হয়েছে সেসবের জন্য ভবন মালিক অবশ্যই দায়ী। ভবনে ফাটল দেখার পর কারখানা চালু রাখার জন্য মালিক পক্ষ থেকে 'চাপ' প্রয়োগ করা হয়। তাই রানা প্লাজায় বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের এক হাজার ১৩২ জন শ্রমিকের হত্যার দায় মূলত মালিক পক্ষের ওপর পড়ে। এক্ষেত্রে বিজিএমইএ অতীতের মতো মালিকপক্ষের সাফাই গাইছে। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে তাজরীন ফ্যাশনে ১১২ জন নিহতের ঘটনায় সংগঠনটি সুকৌশলে মালিকপক্ষকে রক্ষার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পের মালিকপক্ষের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ জবাবদিহিতা আর দায় এড়িয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিকে আরো প্রতিষ্ঠা করছে। ভবিষতে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় এই সংগঠন কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে- তা প্রশ্নসাপেক্ষই বটে।

নাশকতা ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে এই তৈরি পোশাক শিল্পে। অথচ এই খাতে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে এখনও একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আসেনি। শ্রমিকের স্বার্থ সমুন্নত রাখা এবং শ্রমিকবান্ধব স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মালিকপক্ষের বাস্তবায়িত ভূমিকা খুবই নগন্য।

পোশাক শিল্পে যখন অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে এসে নিয়ন্ত্রণহীন ও অসংগঠিত রূপে বিক্ষোভ প্রকাশ করে তখন মালিকপক্ষ সমস্যা সমাধানের পথ ত্বরান্বিত করার চেয়ে উস্কানি বা শঙ্কাজনক কিছু বক্তব্য বাজারে ছড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন সময়কালের বিজিএমইএ'র সভাপতিসহ কর্তা ব্যক্তিদের মুখে যে শব্দগুলো সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হতে দেখা গেছে তা হলো 'এটা নাশকতার অংশ' বা 'বহিঃশক্তির ষড়যন্ত্র' 'এই শিল্পকে ধসের পাঁয়তারা' প্রভৃতি। যখন এই ধরনের নাশকতা ও ষড়যন্ত্রের বিষয় থাকে তখন সেখানে 'বিরাট আশঙ্কাটাই' স্বাভাবিক। এই ধরনের প্রোপাগান্ডা বাজারে বেশি আলোচিত থাকলে মূল সমস্যাটি অন্তরালে চলে যায় বা হালকা হয়ে যায়।

৬০, ৭০ ও ৮০ দশকের দিকে ল্যাটিন আমেরিকায় যখন ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্প এই ধরনের চর্চার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তখন একই ধরনের সংকট দেখা দেয়। অন্যদিকে যখনই এই শিল্পে বড় ধরনের শ্রমিক অসন্তোষ দেখা যায় তখন সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কমিটি হয়। কমিটির প্রতিবেদন অনেক সময় প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনগুলোতে মালিকপক্ষের কিছু কিছু বক্তব্য অনেকটা 'কপি এন্ড পেস্ট' আকারে স্থান পায়। সরকারের বক্তব্যে 'নাশকতার' কথা প্রায়ই বলা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন 'নাশকতা' সৃষ্টিকারী কোনো দেশীয় বা বহিঃশক্তি বা তার এজেন্টকে গণমাধ্যমে হাজির করতে পারেনি। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, রাষ্ট্র যন্ত্র কী সচেতনভাবে এই 'নাশকতাকারীদের' পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে, নাকি শ্রমিকের নায্য দাবি থেকে তাকে সরিয়ে রাখার জন্য সরকার ও বিজিএমইএ যৌথভাবে এই তকমা এটে দেয়।

এই শিল্পের ক্ষেত্রে যদি বহিঃশক্তির সংযুক্ততা থাকে তা অবশ্যই খুঁজে বের করা প্রয়োজন। অথচ সেটিও করা হয় না। কারণ, এই তত্ত্বটিকে যতদিন জিইয়ে রাখা যাবে, দায় এড়ানো ততই সহজ হবে।

তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় লোকবলের সঙ্কট

শ্রম সচিব মিকাইল শিপার সাংবাদিকদের জানান, ১৯৬২ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রধান কারখানা পরিদর্শকের কার্যালয়ে ৩১৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকার কথা। সেখানে বর্তমানে ১৮৪ জন রয়েছে। এই জনবল নিয়ে একটি কারখানা পরিদর্শনের পর আবারও সেই কারখানা পরিদর্শনে যেতে সময় লাগবে দুই বছর। কিন্তু কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য এই ধরনের পরিদর্শন নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন। সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরামকে সহায়তা দেওয়ার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবকে আহ্বায়ক করে ১২ সদস্যের শ্রমিক কল্যাণ বিষয়ক টাস্কফোর্স, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবকে আহ্বায়ক করে ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা বিষয়ক টাস্কফোর্স সেল গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এই টাস্কফোর্স দুটি লাখ লাখ শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় কার্যত কোনো ভূমিকা পালন করছে না।

একের পর এক দুর্ঘটনায় পোশাক কারখানাগুলো মৃত্যুফাঁদে পরিণত হচ্ছে। গরীব এন্ড গরীব, হামীম, তাজরীনের মতো বড় ধরনের ঘটনাগুলো গণমাধ্যমে আলোচিত হওয়ার পর তা নিয়ে কিছুদিন পর্যন্ত আলোচনা চলে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এগুলো থেকে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসে না। বরং এসব ক্ষেত্রে বিজিএমইএ, মালিকপক্ষ আর সরকারকে একই সুরে কথা বলতে দেখা যায়। ফলে অব্যবস্থাপনা আর অবহেলার জন্য দেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাতের শ্রমিকরা সার্বক্ষণিক শঙ্কা আর ভয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা ও শ্রমিকের জীবনের অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য নতুন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি স্বতন্ত্র দপ্তর সৃষ্টির মাধ্যমে কারখানা ব্যবস্থাপনা নজরদারি করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকসমূহ ও নিউ ইয়র্ক টাইমস্।

বিল্লাল খসরু : মানবাধিকার কর্মী।
billal.khasru@gmail.com

শ্রমিক ও মালিক পক্ষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের যৌক্তিকতা নির্মাণ

হোজ্জাতুল ইসলাম

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান সংকটের অন্যতম একটি কারণ হলো শ্রমিক ও মালিক পক্ষের দ্বন্দ্ব। আমরা সাধারণত এই দ্বন্দ্বের শ্রমিক পক্ষের যৌক্তিকতার সাথেই বেশি পরিচিত। এখানে আমরা মালিক পক্ষের যৌক্তিকতাগুলোকে জানার চেষ্টা করবো এবং তাদের যৌক্তিকতার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন দাঁড় করানোর চেষ্টা করবো। একই সাথে এই দ্বন্দ্ব নিরসন করে কীভাবে শ্রমিকের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো যায়- সে বিষয়টির প্রতিই এই লেখায় আলোকপাত করা হবে।

স্বকীয় কিছু অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তৈরি পোশাক শিল্পের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কারখানার মালিকদের খুব বেশি বিকল্প থাকে না। প্রথমত, এই শিল্পের ক্রেতারা অত্যন্ত দাপটে পণ্যের ডেভলপমেন্ট থেকে শুরু করে, এতে কী ধরনের কাপড়/বোতাম/জিপার/সুতা, এমনকি কী ধরনের প্যাকেজিং উপকরণ ব্যবহার করা হবে সেটিও নির্ধারণ করে দেয়। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের শতাধিক দেশের হাজার হাজার কারখানা আছে যাদের মধ্যে গুণগত মানের খুব বেশি পার্থক্য নেই। তাই যে কারখানা সবচেয়ে কম দামে পণ্য বিক্রি করতে পারে ক্রেতারা তাদেরকেই বেছে নেয়। এছাড়া যদিও গার্মেন্টস ব্যবসায় নতুন প্রতিযোগীর আগমন কঠিন কারণ এতে অনেক এককালীন মূলধনের দরকার হয়, তবে একবার যারা উচ্চ মূলধন নিয়োগ করে এই ব্যবসায় আসে তাদের জন্য এর থেকে বের হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ, সেলাই মেশিন, ওয়াশিং প্লান্ট ইত্যাদির ব্যবহার গার্মেন্টস ছাড়া আর অন্য কোনো ব্যবসায় তেমন নেই।

ফলে এই ব্যবসায় প্রতিযোগিতা অনেক বেশি। এছাড়াও কারখানা ভবনের উচ্চ ভাড়া এবং বিদ্যুৎ-গ্যাস সংক্রান্ত মাসিক নির্দিষ্ট ওভারহেড খরচের পুষিয়ে নেয়ার জন্য পোশাক কারখানার মালিকরা পূর্ণ ক্যাপাসিটিতে কারখানা চালানোর জন্য অত্যন্ত কম মার্জিনে অর্ডার নিতে বাধ্য হয়।

তৈরি পোশাকের ক্রেতারা কারখানা মালিকদের এই সীমাবদ্ধতাগুলো বেশ ভালোই জানেন এবং কারখানার মালিকদের নামমাত্র মূল্য দিয়ে এ সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করেন ক্রেতাগণ। অর্থনীতির ভাষায় পণ্য উৎপাদনকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এই অবস্থাকে বলা হয় প্রাইস টেকার (Price taker)। কিন্তু তারা তাদের কারখানায় তৈরিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণকে প্রভাবিত করতে পারে না।

যে শিল্পে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের তৈরিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণকে প্রভাবিত করতে পারে না, মুনাফা লাভের জন্য তারা প্রধানত অপারেশনাল কার্যদক্ষতার উপরেই নির্ভর করে। তাই বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে ফ্যাক্টরি পরিচালনার ক্ষেত্রে শক্তভাবে খরচ কমানোর চেষ্টা করাই হচ্ছে মুনাফা তৈরির একমাত্র পথ। পোশাক তৈরির খরচের সিংহভাগই ব্যয় হয় কাপড় (ফেব্রিক্স) ও আনুষঙ্গিক উপকরণ (যেমন- বোতাম, জিপার, সুতা ইত্যাদি) কিনতে। এক্ষেত্রেও ফ্যাক্টরিগুলোর তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের জন্য তৈরি পণ্যে কোন কোম্পানির কাপড় ও আনুষঙ্গিক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে সেটিই শুধু নির্দিষ্ট করে দেয় না বরং এসব উপকরণের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি দর কষাকষি করে পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেয়। ফলে এসব উপাদান সংযোজনের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের সুযোগ পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের থাকে না।

পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে কাপড় ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পরবর্তী প্রধান খরচের উৎসই হচ্ছে শ্রমিকদের বেতন। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিকরা যেহেতু তাদের তৈরিকৃত পণ্যের দাম অথবা সংশ্লিষ্ট কাঁচামালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে পারে না, তাই তারা যেটি তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে

(শ্রমিকদের বেতন) সেটিকে সর্বোচ্চভাবে নিয়ন্ত্রণ বা নিষ্পেষণ করার চেষ্টা করে। ফায়ার কোড বা বিল্ডিং কোডসহ অন্যান্য নীতিমালা ভঙ্গ করে অনিরাপদ কারখানা নির্মাণ করে খরচ কমানোর একটি অশুভ প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে থাকে। আর এ জন্যই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হতে পোশাক শ্রমিকদের।

শ্রমিক ও মালিকের এই সম্পর্কের হিসেবে এই সমীকরণে মালিকরাই শক্তিশালী পক্ষ। তাদের এই অগাধ ক্ষমতার মূলেও সেই অর্থনীতি। কারণ গার্মেন্টস শিল্পে মেশিন চালাতে তেমন কোনো দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। অল্প কিছুদিনের প্রশিক্ষণে যে কেউই এ ধরনের মেশিন চালাতে পারে। ফলে এ শিল্পের শ্রমিকরা সহজেই প্রতিস্থাপনযোগ্য, আর তাই কারখানার মালিকদের বিপক্ষে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়ে দর-কষাকষির তেমন কোনো ক্ষমতা থাকে না। এর পাশাপাশি রয়েছে সরকারের সুদৃষ্টি। সরকার এই শিল্পকে যে প্রণোদনা সুবিধা দেয়, সেটিকে মালিকরা শুধুমাত্র নিজেদের অর্থনৈতিক মুনাফা বৃদ্ধির অংশ হিসেবেই বিবেচনা করে, এখানে শ্রমিকের কোনো স্বার্থ বিবেচনায় নেওয়া হয় না।

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, সপ্তাহে ৬০-৮০ ঘণ্টা কাজ করা একজন শ্রমিকের অবশ্যই তার পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর আর্থিক সামর্থ্য থাকা উচিত। তাছাড়া, কাজের অভিজ্ঞতা বাড়লে তাদের পদোন্নতি হওয়া উচিত এবং বেতন বৃদ্ধিও হওয়া উচিত যা তাদের জীবনযাত্রার মান আরও বৃদ্ধি করবে। নিদেনপক্ষে, মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন বৃদ্ধি হওয়া উচিত যাতে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি না হলেও, বছর বছর বাড়িভাড়াসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

বর্তমান বাজারে (শ্রমিকদের সর্বশেষ দাবি) মাসিক ন্যূনতম আট হাজার টাকা বেতন দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করা যে কত অসাধ্য সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে যৌক্তিক দাবি; তবে এ ব্যাপারে

গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিকরা যেহেতু তাদের তৈরিকৃত পণ্যের দাম অথবা সংশ্লিষ্ট কাঁচামালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে পারে না, তাই তারা যেটি তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে (শ্রমিকদের বেতন) সেটিকে সর্বোচ্চভাবে নিয়ন্ত্রণ বা নিষ্পেষণ করার চেষ্টা করে।

কারখানা মালিকরা পাল্টা যুক্তি দেয়। পোশাক কারখানার মালিকরা উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণে (বাৎসরিক প্রায় ১০%) নানাবিধ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রতিনিয়ত বিদ্যুত ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি এবং স্থানীয় বাজার থেকে কেনা অন্যান্য উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি তাদের উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে, বিদেশি ক্রেতারা কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির সাথে তাল মিলিয়ে পোশাকের দাম বাড়িয়ে দিতে চান না। এছাড়াও সার্বিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন বিষয় যেমন- রাজনৈতিক অস্থিরতা (হরতাল বা ধর্মঘট), অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবহন ব্যবস্থার ঘাটতি এবং সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মও তৈরি পোশাকের খরচ অনেক বাড়িয়ে দেয়। কারখানার পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা ও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা দিতে হলে যে অতিরিক্ত খরচ হবে সেটি গার্মেন্টস মালিকদের অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে পুষিয়ে নিতে হবে। তাই তাদের মতে, গার্মেন্টস মালিকদের পক্ষে অর্থনৈতিক বিবেচনা অগ্রাহ্য করে শুধু মানবিক দিক বিবেচনা করে শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি শ্রমিকদের দাবি যৌক্তিক হয় এবং গার্মেন্টস মালিকদের পাল্টা যুক্তিও যথাযথ হয়, তাহলে সমাধান কী? সমাধান খোঁজার আগেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশের দাবি আপোসযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে, ইতোমধ্যেই এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে গার্মেন্টস মালিকদের হাতে মুনাফা বৃদ্ধি/নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত কৌশল না থাকাই শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মানতে না পারার অন্যতম কারণ। অতএব গার্মেন্টস মালিকদের মুনাফাবৃদ্ধির বিকল্প উপায়ের মধ্যেই আমাদের সমাধান খুঁজে নিতে হবে।

মুনাফাবৃদ্ধির একটি মূল উপায় হচ্ছে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, যেটি গার্মেন্টস শিল্পে ক্রেতাদের অগাধ ক্ষমতার কারণে অত্যন্ত কঠিন। তবে অতিরিক্ত ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব। তুলনামূলক কম সময়ে পণ্য ডেলিভারি দেওয়া, ধারাবাহিকভাবে নির্ভরযোগ্য পণ্যের সরবরাহ করার মাধ্যমে বিশ্বস্ত পার্টনারে পরিণত হওয়া এবং ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে প্রিমিয়াম চার্জ করা সম্ভব। ফ্যাক্টরিতে সর্বোচ্চমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা অথবা পরিবেশ দূষণ কমানোর মতো ব্যবস্থাকে শুধু খরচ হিসেবে না দেখে, এটিকে পয়েন্ট অব ডিফারেন্সিয়েশন হিসেবে ব্র্যান্ডিং করতে হবে। পোশাক কারখানাগুলো বিদেশি ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এসব বৈশিষ্ট্য ক্যাম্পেইন উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

বিজিএমইএ'র মতো প্রতিষ্ঠান এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে বিদেশি ক্রেতাদের সাথে যৌথভাবে কনজ্যুমার মার্কেটিং করতে পারে। ইন্টারনেটের এই যুগে অত্যন্ত কম খরচেই এ ধরনের অনলাইন মার্কেটিং করা যেতে পারে। যেসব গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করবে, শুধু তারাই এই লেবেল ব্যবহার করতে পারবে এবং ফলে তাদের প্রতিটি পণ্যের জন্য অতিরিক্ত যথাযথ পরিমাণের চার্জ যোগ করতে সক্ষম হবে।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকার জন্য শুধু স্বল্প মূল্যের শ্রমের উপর নির্ভর করার অবকাশ নেই। বরং বিকল্প উপায়ে খরচ কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে। গার্মেন্টসের সহযোগী শিল্প (যেমন- সুতা উৎপাদন, ফেব্রিক্স, বোতাম ইত্যাদি) বিকাশে সরকার এবং ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত উদ্যোগে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে।

এই শিল্পগুলোকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এইসব কাঁচামাল পাওয়া গেলে এসব সংগ্রহে চীন, সিঙ্গাপুর বা হংকং থেকে আমদানি করার তুলনায় অত্যন্ত কম সময় দরকার হবে যা পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সময় বাড়িয়ে দিবে, পরিবহণ খরচ কম হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। এছাড়া এইসব শিল্পে প্রচুর কর্মসংস্থান হওয়ার পাশাপাশি কাঁচামালের জন্য আমদানি নির্ভরতা কমার কারণে গার্মেন্টস শিল্পের জাতীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। গার্মেন্টস শিল্পের প্রবৃদ্ধির আরো একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মেধার অভাব। দেশের গার্মেন্টসগুলোতে উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত বেশিরভাগ কর্মচারী-কর্মকর্তাদেরই তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই বা অনেকের সার্টিফিকেট থাকলেও শিক্ষার গুণগত মান তেমন ভালো নয়। ফলে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে প্রচুর অকার্যকরতা (operational inefficiency) রয়েছে, যা পোশাক তৈরির খরচকে অকারণে বাড়িয়ে দেয়।

মার্চেন্ডাইজিং পেশায় নিয়োজিতদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলনামূলক ভালো হলেও দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থীরা গার্মেন্টসে কাজ করতে আগ্রহী হয় না। ফলে বিদেশি ক্রেতাদের নতুন নতুন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় দেশীয় গার্মেন্টসগুলো। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মেধাবী তরুণদের গার্মেন্টস শিল্পে ক্যারিয়ার গঠনে আগ্রহী করে তোলার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিতে হবে। শুধু মার্চেন্ডাইজিংয়েই নয়, বরং প্রোডাকশনসহ সকল ধরনের ম্যানেজমেন্ট

পদগুলোতেই মেধাবী ও শিক্ষিতদের আকৃষ্ট করতে হবে।

এছাড়াও বৃহৎ পরিসরের অর্থনৈতিক অনেকগুলো বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সুবিধা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে, যা শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন এবং নিরাপদ কারখানা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে। পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার হাত থেকে গার্মেন্টস শিল্পকে রক্ষা করা গেলে বিশ্ববাজারে আমাদের গার্মেন্টস কোম্পানিগুলোর গ্রহণযোগ্যতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি মুনাফা বৃদ্ধিরও সুযোগ তৈরি হবে যা শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। এ ছাড়াও গার্মেন্টস শিল্পে সরকারের অবদানের কারণে শ্রমিকদের পক্ষে মালিকদের সঙ্গে মজুরি নির্ধারণ বা অন্যান্য আলোচনায়ও সরকার জোরালো ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান প্রশ্নাতীত। গত কয়েক দশকে এ শিল্পের অসামন্য অগ্রগতি বিশ্বের দরবারে 'বাংলাদেশ' এবং 'গার্মেন্টস' শব্দ দুটোকে অনেকটা সমার্থক করে তুলেছে। তাই এ শিল্পের কোনো নেতিবাচক সংবাদ আমাদের সমগ্র দেশেরই ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। আর বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার যে স্বপ্ন আমরা দেখি, সেটি বাস্তবায়নের জন্য এই শিল্পের যথাযথ পরিচর্যা করার বিকল্প নেই। গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সরকার ও বিরোধীদলের সম্মিলিত প্রয়াসে কৌশলগত দিক বিশ্লেষণ করে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

হোজ্জাতুল ইসলাম : মানবাধিকার কর্মী।
hozza.shomoy@gmail.com

লেখা আহ্বান

মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। পাশাপাশি পত্রিকা সম্পর্কে যেকোনো গঠনমূলক সমালোচনাও আমাদের প্রয়াসকে সমৃদ্ধ করবে। নাগরিক উদ্যোগ ত্রৈমাসিক নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশেও আগ্রহী। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, নাগরিক উদ্যোগ ত্রৈমাসিক, ৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। ই-মেইল : nuddyog@gmail.com।

‘মেইড ইন বাংলাদেশ’-এর সস্তা টি-শার্ট
দর কষাকষি তত্ত্বের পেছনে লাশের মিছিল

নূর-এ-জান্নাতুল ফেরদৌস রুহী

“এরপর আপনি যখন ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ লেখা প্রিমার্ক ব্র্যান্ডের একটি টি-শার্ট আড়াই ডলার দিয়ে কিনবেন, তখন কি আপনার জানতে ইচ্ছে হবে যে দাম এতো কম হয় কীভাবে?” ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভার বাসস্ট্যান্ডে রানা প্লাজা নামের ভবনটি ধসে পড়লে যুক্তরাজ্যের দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকা তাদের একটি প্রতিবেদনে এমনই প্রশ্ন রেখেছেন দেশটির ভোক্তা-শ্রেণীর কাছে। যুক্তরাষ্ট্রের সিএনএন তাদের প্রতিবেদনের শিরোনামটাই করেছেন এভাবে, বাংলাদেশের কারাখানায় ধস : আমাদের এতো সস্তা পোশাকের মূল্য আসলে কারা দিচ্ছে? কানাডার দৈনিক দ্য গ্লোব এন্ড মেইল পত্রিকাতেও এমনই কিছু প্রশ্ন রাখা হয়: আপনি যদি জো ফ্রেশের তৈরি পোশাক পরেন, তবে কী আপনি আপনার নিজ হাতে শত শত মানুষকে হত্যার বিষয়টি মেনে নিতে পারবেন?

রানা প্লাজার পাঁচটি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি ইথারপ্যাক ফ্যাশন লিমিটেড, নিউ ওয়েব বটম লিমিটেড, প্যান্টস ট্যাক, প্যান্টস অ্যাপারেলস এবং ইথার টেক্স থেকে আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের অনেক বড় বড় রিটেইলার কোম্পানিই পোশাক ক্রয় করতো। ব্রিটেনের প্রিমার্কে পোশাক সরবরাহ করতো নিউ ওয়েব ফ্যাক্টরি। দর কষাকষির এই পোশাক চেইন শপের ব্রিটেনে রয়েছে ১৬১টি ব্রাঞ্চ। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের আরেকটি ক্রেতা বনমার্শি (Bonmarché), যার প্রধান কার্যালয় ব্রিটেনের পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের ওয়ার্কফিল্ডে। পুরো ব্রিটেনে এদের ৩৬০টি দোকান রয়েছে। কানাডার জো ফ্রেশের নিজ দেশে রয়েছে ৩০০টিরও বেশি সুপার মার্কেট ও সুপার শপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে আছে ৬৮০টি স্টোর। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিসকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট স্টোর আমেরিকার মাল্টিন্যাশনাল রিটেইলার ওয়ালমার্ট-ও রানা প্লাজার ইথার টেক্স থেকে পোশাক কিনতো। ৬৯টি ভিন্ন ভিন্ন নামে ২৭টি দেশে সর্ববৃহৎ এই রিটেইলারের রয়েছে ১০ হাজার ৭০০টি স্টোর। সম্পদের প্রাচুর্য্য আর চাকচিক্যের আবর্তে থাকা এসব ক্রেতারা স্পষ্টতই জানেন তাদের সম্পদ-প্রাচুর্য্যের উৎস আসলে একেকটি মৃত্যুকূপ! বিজিএমইএ-এর তথ্য মতে, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ব্যবসা শুরু হওয়ার পর গত দুই দশকে ৭০০ গার্মেন্ট শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ২৫টির মতো যে দুর্ঘটনাগুলো শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২১৪টির মতো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আর ভবনধসে এবং অন্যান্য কারণে প্রায় ২ হাজার শ্রমিক মৃত্যু হয়েছে। এই নির্মম মৃত্যুর শিকার শ্রমিকদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী শ্রমিক। সাভারের রানা প্লাজার ধসে পড়ায় শত শত শ্রমিকের মৃত্যু এই তালিকায় নতুন সংযোজন।

সস্তা শ্রমে নিপুণ কারিগর: রপ্তানির বাজারে দ্বিতীয় স্থান অর্জনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব!

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ২০১০-২০১১ সালে বাংলাদেশকে পোশাক শিল্পে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করে। সেই সময় ২০০৭-২০০৮ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাতেও বাংলাদেশ ১৫.৬৬ বিলিয়ন পোশাক রপ্তানি করেছে।

বিজিএমইএ-এর এক হিসাব থেকে দেখা যায়, ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে এ খাতে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল মোট রপ্তানি আয়ের ৭৬ শতাংশেরও বেশি। ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে বাংলাদেশ প্রায় ৯৪৫ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় সাত দশমিক ৫৫ শতাংশ বেশি। ২০১২ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে বিজিএমইএ জানিয়েছে, ২০১৩ সাল নাগাদ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে আড়াই হাজার কোটি মার্কিন ডলার। একটি আন্তর্জাতিক ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্ম ‘ম্যাকিনসে এন্ড কোম্পানি’র মতে, বাংলাদেশের এই পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ২০২০ সালে ৩৬ বিলিয়ন ডলারে পরিণত হবে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের এই ব্যাপক সাফল্যের একমাত্র কারণ হলো শ্রমের সস্তা বাজার। ২০১২ সালের ২৫ আগস্ট মার্কিন দৈনিক নিউ ইয়র্ক টাইমস ‘ওয়েজেস

শ্রমিক কোনো পণ্য নয়, তারাও মানুষ। শিল্পায়নের জন্য মৃত্যু কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না। কিন্তু প্রতিটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগণিত শ্রমিকের মৃত্যু এই সত্য ও কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা বারবার মিথ্যা প্রমাণ করে চলেছে।

ইন বাংলাদেশ ফার বিলো ইন্ডিয়া' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, তৈরি পোশাকের বাজারে বর্তমানে চীনের পর বাংলাদেশের অবস্থান। মাত্র কয়েক বছর আগে তৈরি পোশাক রপ্তানির বাজারে ভারতের অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। কিন্তু বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকের বেতন একেবারেই কম হওয়ায় রপ্তানির বাজারে ভারতের স্থান দখল করেছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের পারদর্শিতা। স্বল্প বেতন সত্ত্বেও তারা জীবিকার প্রয়োজনে যতটা সম্ভব সেলাই কাজ চমৎকারভাবে করে যাচ্ছে। টমি হিলফিগার, গ্যাপ, ক্যালভিন ক্লাইনের মতো বিশ্বসেরা ব্র্যান্ডের কাপড় মাত্র ৩৭ ডলারে মাসিক মজুরিতে তারা তৈরি করছেন নিপুণ কারিগরের মতো।

বাংলাদেশের কাগুজে আইন, আমদানিকারক দেশের বৃদ্ধাঙ্গুলি!

বাংলাদেশে সংবিধানেই রাষ্ট্র প্রতিটা মানুষের জীবন রক্ষায় বাধ্য। সেক্ষেত্রে ফ্যাক্টরির মালিকদের এটা আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব যে তারা প্রতিটা শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সংবিধানের ৩১ এবং ৩২ নং অনুচ্ছেদে জীবনের নিরাপত্তার বিধান স্পষ্ট রয়েছে। এছাড়া ২০০৬ সালের শ্রম আইনে শ্রমিকের মৌলিক অধিকার এবং মাতৃত্বকালীন ছুটির কথা বলা হয়েছে। আবার নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ-১৯৭৯ বা সিডো সনদের প্রতিটা অনুচ্ছেদই নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের বিধান রয়েছে। সিডোর অনুচ্ছেদ ৩-এ নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার, অনুচ্ছেদ ১১ (১)-এ কর্মসংস্থানে সকল মানুষের মৌলিক অধিকার, ১১ (২)-এ বিবাহ অথবা মাতৃত্বের জন্য বৈষম্য করা যাবে না এবং অনুচ্ছেদ ১৫-তে নারী আইনগত এবং নাগরিক অধিকারের বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

'হাই স্ট্রীটে পণ্য বিক্রয় করে অর্থ আয় করলে অর্থ আয়কারী প্রতিষ্ঠানকে পণ্য উৎপাদনের জায়গায় মৌলিক ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করতে হবে'-এটা ব্রিটেনের ১৮০২ সালে 'ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট'-এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালভিন ক্লেইন এবং জার্মান রিটেইলার টিসিবো 'বাংলাদেশ ফায়ার এন্ড বিল্ডিং সেফটি এগ্রিমেন্ট'-এ স্বাক্ষর করে। পণ্য সরবরাহকারী ফ্যাক্টরিগুলোতে সরবরাহকারীদের স্বাধীনভাবে পরিদর্শনের অধিকার প্রদান করা হয় এর মাধ্যমে। সম্প্রতি ওয়ালমার্টকে এখানে স্বাক্ষর করার জন্য অনুরোধ জানান কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য জর্জ মিলার।

শ্রমিক কোনো পণ্য নয়, তারাও মানুষ। শিল্পায়নের জন্য মৃত্যু কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না। কিন্তু প্রতিটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগণিত শ্রমিকের মৃত্যু এই সত্য ও কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা বারবার মিথ্যা প্রমাণ করে চলেছে। পিছে আইন শুধু কাগজে লেখা বাক্য হয়েই থাকছে। পকেট ভরছে মালিকদের, বিদেশি ডলারে রাষ্ট্র ভরছে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টগুলো, আর দর কষাকষির মহান নীতিতে উন্নত, সম্পদশালী দেশ আরো সমৃদ্ধ হচ্ছে। এ ধরনের চক্রে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে টেনে-হিচঁড়ে একটানে ২য় স্থানে নিয়ে আসাটা শ্রমিকদের নিরাপত্তাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর মতোই মনে হয় যেন!

'সেভ মানি, লিভ বেটার' ওয়ালমার্ট-এ বিজ্ঞাপনী স্লোগান

পণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বল্পমূল্যের মজুরিশ্রমই পণ্যের দাম কমিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সবচেয়ে উত্তম পথ। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই ১৯৬২ সালে যাত্রা শুরু করা ওয়ালমার্টের স্লোগান ছিল 'লো প্রাইজ অলওয়েজ'। বাজারের ক্রেতাদের কাছে ডিসকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট হিসেবে পরিচিত হওয়ার রূপকল্প-ই তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল। এতে তারা সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করে। আজ ওয়ালমার্ট বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিসকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট স্টোর। আমেরিকার মাল্টিন্যাশনাল এই রিটেইলার ২৭টি দেশে ৬৯টি ভিন্ন ভিন্ন নামে ১০ হাজার ৭০০টি স্টোরের মাধ্যমে ব্যবসা করছে। তাদের বাৎসরিক বিক্রি প্রায় ২৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২১ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা।

ওয়ালমার্টের ১৯ বছরের স্লোগান পরিবর্তন করে ২০০৭ সালে রাখা হয় 'সেভ মানি, লিভ বেটার'। তারা একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেখায় যে, 'ছোট জিনিসের সংযোজনের মাধ্যমে কীভাবে টাকা বাঁচানো যায় এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় পরিবারের জীবনযাপনে তা সহায়তা করে।' তারা একটি গবেষণার মাধ্যেমেও এটা দেখায় যে, ২০০৬ সালে তারা প্রতিটা মার্কিন পরিবারের অর্থ বাঁচিয়েছে ২ হাজার ৫০০ ডলার, ব্যক্তিপ্রতি বাঁচিয়েছে ৯৫৭ ডলার এবং ভোক্তার বাঁচিয়েছে ২৮৭ বিলিয়ন ডলার। গবেষণায় আরো বলা হয়, ওয়ালমার্ট ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সকল পণ্যেই ভোক্তা মূল্যে ৩ শতাংশ করে কমিয়েছে।

উন্নত, সম্পদশালী আর ধনী দেশের লেবাসধারী এসব দেশের এই ধনের উৎসই

হলো দরিদ্র দেশগুলোকে আরো দরিদ্র করে নিজের ফায়দা লোটা। মৃত্যুর দরজা সর্বদা খোলা রেখে নিজে রাজ সিংহাসনে বসে দর কষাকষির সস্তা তত্ত্বের রহস্যে আবর্তিত তারা। দরিদ্র দেশগুলোতে আমাদের পোশাকের দর কষাকষি কি দরিদ্রতা ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে না? বাংলাদেশের তৈরি পোশাক যদি এই দেশগুলো ক্রয় না করতো তবে কী তারা এতোটা সম্পদশালী হতো? এদেশে যদি বড় কোনো দুর্ঘটনাও ঘটে, তারপরও এসব কোম্পানি এদেশের তৈরি পোশাকের লোভ ছেড়ে যাবে না। আর যতই তারা বলুন না কেন, তৈরি পোশাকে শুল্কমুক্ত সুবিধাও তারা বাদ দিবেন না। বাণিজ্যে বিশ্বায়ন যেন দায়িত্বে শুধু অনীহাকেই সামনে আনছে যেন! বিষয়টা এমন যে, যত সস্তায় পাওয়া যায়, ততোটাই ভোক্তার লাভ। বিশেষ করে, মন্দার অর্থনীতিতে, অনেকের কাছেই সস্তায় পোশাক প্রাপ্তি একটা লাভজনক উপায়। পশ্চিমের অনেক দেশই দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। সস্তায় পোশাক তাদের দরকার। আবার বাংলাদেশও দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করছে, আছে বেকারত্বেও আধিক্য, এখানে দরকার কর্মসংস্থান। এ ধরনের একটি প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে, মানবাধিকারের বিষয়টি মাথায় রেখেই ব্যবসার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের মূলনীতি অনুসরণ করে, রাষ্ট্র এবং কর্পোরেট বিজনেসকে এক কাতারে দাড়িয়ে শ্রমিকের অধিকার, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

সাংবাদিক ও কলাম লেখক
jannatulruhi@gmail.com

গত ১২ বছরে দেশের সার্বিক রপ্তানি আয়ের সাথে তৈরি পোশাক খাতের মাধ্যমে অর্জিত রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র

(মার্কিন ডলারে, মিলিয়ন এককে)

অর্থ-বছর	সর্বমোট রপ্তানি আয়	তৈরি পোশাক খাতের মাধ্যমে রপ্তানি আয়
২০০১-০২	৫৯৮৬.০৯	৪৫৮৩.৭৫
২০০২-০৩	৬৫৪৮.৪৪	৪৯১২.০৯
২০০৩-০৪	৭৬০২.৯৯	৫৬৮৬.০৯
২০০৪-০৫	৮৬৫৪.৫২	৬৪১৭.৬৭
২০০৫-০৬	১০৫২৬.১৬	৭৯০০.৮
২০০৬-০৭	১২১৭৭.৮৬	৯২১১.২৩
২০০৭-০৮	১৪১১০.৮	১০৬৯৯.৪
২০০৮-০৯	১৫৫৬৫.১৯	১২৩৪৭.৭৭
২০০৯-১০	১৬২০৪.৬৫	১২৪৯৬.৭২
২০১০-১১	২২৯২৪.৩৮	১৭৯১৪.৪৬
২০১১-১২	২৪২৮৭.৬৬	১৯০৮৯.৬৯
২০১২-১৩	২৭০১৮.২৬	২১৫১৫.৭৩

সূত্র : www.bgmea.com.bd

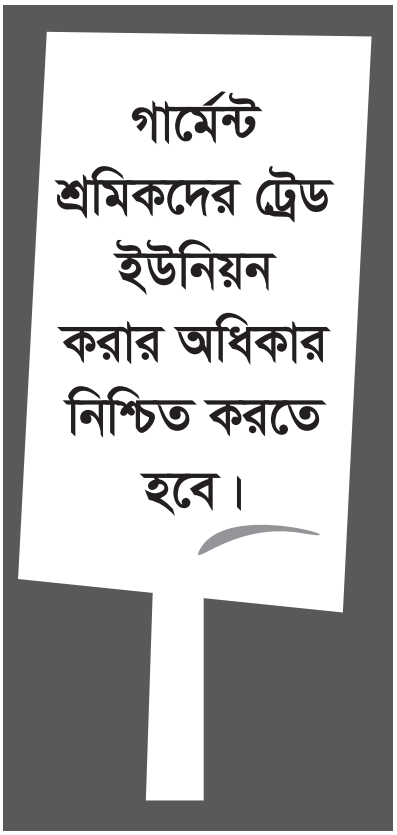

পোশাক কারখানা নাকি মৃত্যুকূপ?

সুবীর দেওয়ান

বাংলাদেশের ইতিহাসে এযাবৎকাল ঘটে যাওয়া সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলাম আমরা সবাই। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে সাভারে রানা প্লাজা ধসে পড়ার ঘটনায় সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু বাংলাদেশসহ বিশ্বের জনগণকে মর্মাহত ও ব্যথিত করেছে। পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ-এর অভাব এবং হেয়ালিপনার ফলাফল কত যে নির্মম ও ভয়াবহ হতে পারে তা বোধ হয় আর ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। তাজরীন ফ্যাশনস-এর ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনায় ১১২ জনের মৃত্যুর শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার সাভারে ৮তলা ভবন ধস বাংলাদেশের জনগণকে বাকরুদ্ধ করে কাঁদিয়েছে অনেকদিন।

বিশ্বের সর্বনিম্ন মজুরি প্রদান ও অনিশ্চিত চাকুরির সুযোগ প্রদানের আড়ালে গার্মেন্টস সেক্টর-এর মালিকেরা অধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন করছে এবং হাজার শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু তারই উদাহরণ। প্রতিনিয়ত কেউ না কেউ গার্মেন্টস সেক্টরে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেই। এতোসব দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা হবে বর্তমান আলোচনায়।

কারা দায়ী

অমানবিক কাজের পরিবেশ, স্বল্প মজুরি, শারীরিক অমর্যাদা, অনিয়মিত এবং বকেয়া মজুরি প্রদান না করা প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদন করছে এবং রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। দুর্বল অবকাঠামো, ফায়ার এক্সিট না থাকায়, উঠা নামার সিড়ি প্রশস্ত না হওয়া, আগুন নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না থাকা, বাহির হওয়ার দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কারণে গার্মেন্টসগুলোতে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এসব ঘটনায় মূলত কারখানার মালিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যারা থাকেন তারাই প্রাথমিকভাবে দায়ী থাকেন। এছাড়া দুর্ঘটনা পরবর্তী ফলপ্রসু ব্যবস্থা গ্রহণ না করার দায় থাকে তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রেতাদেরও দায় এসে যায় এসব কারখানার কর্মপরিবেশ তদারকি ও উন্নয়ন সাধন না করেই তাদের পণ্য প্রস্তুত করে নেওয়ার কারণে।

প্রথমত: প্রতিষ্ঠানের মালিকদের প্রথম এবং নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। নিরাপত্তা বাস্তবায়নে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয় তাহলে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বিজিএমইএ। রানা প্লাজার মতো ভবন ধসে পড়লেই শুধুমাত্র সরকার এবং মিডিয়া কার্যকর থাকবে তা না। সরকারি পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত করা উচিৎ এবং কোনো প্রকার ত্রুটি সম্পন্ন ভবন বা ব্যবস্থাপনা নজরে আসলে সে সম্পর্কে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। যেহেতু বিজিএমইএ বাংলাদেশ গার্মেন্টস সেক্টরের অভিভাবক তাই গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্বমানের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে উক্ত বিষয়ে এ্যাডভোকেসি করবে।

দ্বিতীয়ত: সরকার এবং সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান-এর দায়িত্ব হচ্ছে শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিকদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং ব্যবস্থা উন্নয়ন করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা। মন্ত্রণালয় এবং এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের আদেশে সরকারি কর্মকর্তাগণ বিষয়গুলো মনিটর করবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানেই সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। কিন্তু বাস্তবে, অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্ষমতাশীল লোকদের ছত্রছায়ায় থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত: আন্তর্জাতিক ক্রেতা এবং রিটেইলারস গামেন্টস সেক্টরের একটি বড় মাধ্যম যাদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া যায়। কারণ, চুক্তিতে যাওয়ার পূর্বে তারা গামেন্টস প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এবং গুণগতমান পছন্দ হলে পরবর্তীতে চূড়ান্ত চুক্তির পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু ক্রেতারা যখন দেশে কারখানাগুলো পর্যবেক্ষণ-এর জন্য আসে তখন গার্মেন্ট মালিকেরা তাদেরকে খুশি করানোর জন্য সর্বাত্তোক চেষ্টা করে। ফলে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রকার

অভিযোগ দায়ের করছে না এবং মালামাল ক্রয় করার জন্য চূড়ান্তভাবে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। ফলে ক্রেতাদের মালের ডেলিভারি দেওয়ার জন্য যেকোনো ঝুঁকিতে কারখানা মালিকরা শ্রমিকদের বাধ্য করাচ্ছে এবং যার ফলাফলে তাজরীন ও রানা প্লাজার মতো দুর্ঘটনা ঘটছে।

কেন তারা ভুল করে?

এই প্রশ্নের একটাই উত্তর; টাকা এবং অধিক থেকে অধিকতর মুনাফার অর্জনের উন্মাদনা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশ বাংলাদেশের শ্রমিকদের স্বল্প মজুরিকে পুঁজি করে লাভবান হচ্ছে।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, নিউ ইয়র্ক, সিডনি, টরেন্টো ও লন্ডনের বাজারে যদি কোনো পোশাক ১৪ ডলারে বিক্রি হয় তাহলে খুচরা বিক্রেতা এবং ক্রেতা কোম্পানিগুলো ৬০% মুনাফা লাভ করে। যদিও সরকার এবং পশ্চিমা দেশগুলো ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায়ের ফলে কিছুটা লাভবান হচ্ছে। কিন্তু তারাই অধিকাংশ মুনাফা আয় করছে যারা পণ্য উৎপাদনে কোনো প্রকার নিয়মনীতি মেনে চলে না। বাকী ৪০% এর মধ্যে আমদানি ও স্থানীয় পণ্য আদান-প্রদানে ৩৫ শতাংশ ব্যয় হয়। সর্বশেষ ১ শতাংশেরও কম অবশিষ্ট থাকে শুধু শ্রমিকদের মজুরির জন্য।

উত্তর আমেরিকার খুচরা বিক্রেতারা যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশি পোশাককে বেশি প্রাধান্য দেয়। কারণ, বাংলাদেশ থেকে পণ্য উৎপাদন করালে তাদের অধিক মুনাফা অর্জিত হয় ও ক্রেতাদের স্বল্প মূল্যে পণ্য পৌঁছে দিতে পারে।

নিম্নের সারণিটি* বিশ্লেষণ করলেই বাংলাদেশের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ হওয়ার খুঁজে পাওয়া যাবে।

খাত	ইউএস	বাংলাদেশ
উপাদান	৫	৩.৩০
ইন্ডাস্ট্রিয়াল লন্ড্রি	০.৭৫	০.২০
মজুরি	৭.৪৭	০.২২
মোট ব্যয়	**১৩.২২**	**৩.৭২**

উপরের সারণি অনুযায়ী, বাংলাদেশে যে টি-শার্টটি তৈরিতে ব্যয় হয় ৩.৭২ ডলার আর একই টি-শার্ট তৈরি করতে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয় হয় ১৩.২২ ডলার। উপাদান ক্রয়ের মূল্য দুই দেশের মধ্যে তেমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। ৫ আর ৩.৩০ ডলার যা-কিনা প্রায় সমান কিন্তু মজুরির প্রদানের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে পার্থক্য প্রায় আকাশ-পাতাল। ৩৩% কম মজুরিতে সমমানের পণ্য উৎপাদন সম্ভব বলে বিদেশি উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ থেকে পণ্য ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে।

> বাংলাদেশে যে টি-শার্টটি তৈরিতে ব্যয় হয় ৩.৭২ ডলার আর একই টি-শার্ট তৈরি করতে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয় হয় ১৩.২২ ডলার। উপাদান ক্রয়ের মূল্য দুই দেশের মধ্যে তেমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

অধিক মুনাফা অর্জন করার পরও দেশের অধিকাংশ গার্মেন্টস বড় ধরনের ঝুঁকি নিরসনে তেমন কোনো উদ্যোগ নেয় না। কারখানায় অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা লোক দেখানো এবং ফায়ার সার্ভিসের চোখ ফাঁকি দিতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি রাখা হয়। কিন্তু বাস্তবে যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো দক্ষ লোক নিয়োগ করা হয় না বা নেই। পাশাপাশি গার্মেন্টস-এর নিরাপত্তা প্রহরীদের অসচেতনতাও দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

কারণ, কোনো কিছু না বুঝে তারা মূল গেইটে তালা লাগিয়ে দেয় এমনকি আগুন বা অন্য কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলেও তালা খুলে দেওয়া হয় না। কারণ একটাই মালামালা চুরি বা লুট বন্ধে এই পদ্ধতি। আশুলিয়ার তাজরীন পোশাক কারখানায় জরুরি বর্হিগমন রাস্তা এবং সিঁড়ি না থাকায় ২০১২ সালের ২৫ নভেম্বর অগ্নিকাণ্ডে মোট ১১২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে এবং পাঁচশ-এর অধিক শ্রমিক আহত হয়। আশুলিয়ায় যেসকল বড় বড় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো নজরে পরে তা মনোমুগ্ধকর। কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে মনে হবে কাঁচের জানালা ঘেরা প্রত্যেকটি গার্মেন্টেসে পর্যাপ্ত আলো বাতাস আসা যাওয়ার ব্যবস্থা করা আছে। কিন্তু বাস্তবিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, উক্ত কাঁচের জানালাগুলো ভিতর থেকে লোহার ফ্রেম দিয়ে নিচ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করা যাতে কোনোভাবেই যেন কেউ বের হতে না পারে বা ভিতরে ঢুকতে না পারে। শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য চলমান আইন থাকলেও তা কেউ মেনে চলছে না।

জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ গার্মেন্টস সেক্টর সকল ধরনের অপ্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ায় এখন অন্যায়কে তারা তাদের অধিকার বলে ধরে নিয়েছে। বিজিএমইএ জোর দিয়ে বলে তারা কমপ্লায়েন্স মেনে চলে। কিন্তু বাস্তবে কয়টি গার্মেন্টস মেনে চলছে তা একটু পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যায়। আর যারা মেনে চলছে তাও আবার বিদেশি ক্রেতাদের চাপে বাধ্য হয়ে। গামেন্টস মালিকেরা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি কম দিয়ে নিজেদের অর্থের পাড়ার গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতেও তারা তাদের সম্পত্তি গড়ে তুলছে। কিন্তু যখনই শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি এবং নিরাপত্তার কথা বলা হয় তারা তাদের হাত গুটিয়ে রাখে আর নিরূপায় হওয়ার ভান করে। মালিকেরা টাকার পাহাড় গড়ার স্বপ্নে বিভোর থাকায় শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি আদায় হচ্ছে না আর তাদের স্বপ্ন পূরণে ঝরে যাচ্ছে হাজার শ্রমিকের স্বপ্ন এবং প্রাণ।

তথ্যসূত্র: দৈনিক পত্রিকা ও ইন্টারনেট ব্লগ।

*Source: http://edition.cnn. com/2013/05/02/world/asia/bangladesh-us-tshirt/index.html

সুবীর দেওয়ান: আইনজীবী ও উন্নয়নকর্মী।
tuendewan@gmail.com

বাজার হারানোর শঙ্কা, ঘুরে দাঁড়ানোর এখনই সময়

এ. এস. এম. সাদিকুর রহমান

দেশের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে গত দুই দশক ধরে। যে শিল্পের শুরু মাত্র ১২ হাজার ডলার বার্ষিক রপ্তানি দিয়ে, তা এখন বার্ষিক প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শিল্পে কর্মসংস্থান হয়েছে ৪০ লক্ষ শ্রমিকের। কিন্তু তৈরি পোশাক কারখানার মালিকদের অবহেলা এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে চরম গাফিলতি ও নজরদারিতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার কারণে এ শিল্পই এখন চরম হুমকির মুখে।

নব্বই-এর দশকের শুরু থেকে এই শিল্পের শ্রমিকদের আর্থিক ও পেশাগত নিরাপত্তা নিয়ে চলছে চরম অবহেলা। ফলে আমাদেরকে দেখতে হয়, মিরপুরের সারাকা গার্মেন্টসের অগ্নিকাণ্ডে ৩২ জন শ্রমিকের মৃত্যু, ২০০৬ সালে আশুলিয়ার স্পেকট্রাম সোয়েটার কারখানার ভবন ধ্বসে ৭৭ জনের মৃত্যু, তেজগাঁও এলাকায় ফিনিক্স ভবন ধ্বস, ২০০৬ সালে চট্টগ্রামে কেটিএস গার্মেন্টস কারখানায় আগুন, ২০১২ সালে নভেম্বরে সাভারের তাজরীন ফ্যাশন গার্মেন্টসে আগুনে ১১২ জনের মৃত্যু। এর বাইরে আরো অনেক মাঝারি ও ছোটো-খাটো দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত।

তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ডে শতাধিক শ্রমিকের মৃত্যুতে বাংলাদেশের পোশাক কারখানার শ্রমিকদের জীবন ও কাজের নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্বব্যাপি অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়। ধারণা করা হয়েছিল, তাজরীনের পর সরকার, বিজিএমইএ, মালিক, বায়ার ও ব্র্যান্ড– সবারই সতর্কতা তৈরি হবে। সবার ধারণা ভুল প্রমাণিত করে রানা প্লাজার ধ্বস থেকে পাওয়া গেল এক হাজার ১৩২ শ্রমিকের লাশ। এ মৃত্যুর মিছিল বাংলাদেশের শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার মূলে আঘাত নয়, গার্মেন্টস শিল্পের জন্যও এক অশনিসংকেত।

সর্বশেষ রানা প্লাজা ট্রাজেডির কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাতে এই শিল্প নিয়ে আর অবহেলার সুযোগ নেই। এই শিল্পের অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম, আইন লঙ্ঘন, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা, সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।

তৈরি পোশাক শিল্পের দুর্ঘটনায় হতাহতের বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা এই শিল্পের শ্রমিকদেরকে কতটা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। বিলস্ এর এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্পই শ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো সাভারের ভয়াবহ দুর্ঘটনা প্রচারের ফলে সেসময় বিদেশি ভোক্তারা বাংলাদেশি পোশাক ক্রেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। বিদেশের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনও বাংলাদেশ থেকে পোশাক না কেনার জন্য নিজ নিজ দেশের ক্রেতাদের ওপর চাপ দেয়। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়ও ভোক্তারা সেসময় বিক্ষোভ করেছিল, সাভারে কাজ করা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের স্টোরগুলোর সামনে। এ ঘটনা এমন সময়ে ঘটেছে, যখন বাংলাদেশ থেকে চীন, তুরস্ক, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ার মতো দেশগুলোতে তৈরি পোশাকের খরচ অনেক বেড়ে গেছে। পোশাক শিল্পে এমন সম্ভাবনাময় মুহূর্তে এটি একটি বড় আঘাত। বাংলাদেশে পোশাক তৈরি করতে বিপাকে পড়তে হচ্ছে বলে একটি বিশাল বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এই দেশ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আরও অনেকে এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক কোনো বার্তা বহন করে না। বিশ্বে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ আফ্রিকা পোশাক তৈরি ও রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত। এখন নতুন করে মিয়ানমার তৈরি পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। এরই মধ্যে দেশটি স্বল্পোন্নত দেশের আওতায় ডিউটি ফ্রি সুবিধা নিশ্চিত করেছে, তবে এখনও পুরোপুরি রপ্তানিতে যেতে পারেনি। এ খাতের উদ্যোক্তারা ধারণা করছেন গ্যাস, বিদ্যুৎ ও মানবসম্পদের সংকট না থাকায় এ শিল্পে মিয়ানমার খুব দ্রুত ভালো অবস্থান করে নিবে।

পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উপর এর প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কারখানার মালিকদের আইন অনুসরণ না

করার প্রবণতা, স্বল্প ব্যয়ে অধিকতর মুনাফা অর্জনের অগ্রহণযোগ্য মানসিকতা দেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে বার বার বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ভবন নির্মাণ থেকে শুরু করে কারখানা ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সর্বত্র গাফিলতি ও আইন ফাঁকি দেবার প্রবণতা সুস্পষ্ট। নিউ ইয়র্কভিত্তিক বহুমাত্রিক গণমাধ্যম 'ব্লুমবার্গ'-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশি গার্মেন্টস কারখানায় কর্মপরিবেশ নিরাপদ নয়। সাভার ট্রাজেডিই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। বার বার শ্রমিকদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত হলেও এ খাতকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সরকার তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

গত দুই দশকে তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তেমন কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। অথচ বাংলাদেশের শ্রম আইন (২০০৬) অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে বিল্ডিং কোডও ব্যাপকভাবে অগ্রাহ্য করা হয়, যদিও দেশে 'ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৩' বিদ্যমান এবং ২০০৬ সাল থেকে তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সরকারি নীতিমালা বিভিন্ন সংস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে কি না, তা সঠিকভাবে তদারকি হচ্ছে না। কারখানার কমপ্লায়েন্সের জন্য যেসব দায়িত্বশীল বিভাগ, যেমন- শ্রম অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কারখানা পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ, অগ্নিনির্বাপণ কর্তৃপক্ষ, ভবন নির্মাণ কর্তৃপক্ষ- এদের কেউই তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না। মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ যেভাবে কারখানার কমপ্লায়েন্স তদারক করছে, তাতেও ত্রুটি রয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত পোশাক কারখানাগুলোর বেশির ভাগই বিজিএমইএ'র সদস্য হলেও দুর্ঘটনার পর তারা দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ কিংবা সদস্যপদ বাতিল করে না। সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় নেতা এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত বলে দুর্ঘটনা ঘটার পরও পার পেয়ে যাওয়া তাদের জন্য বেশ সহজ হয়।

সর্বোচ্চ বেতন সর্বনিম্ন বেতনের ২০ গুণের চেয়েও বেশি। সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারণ করা হলেও সর্বোচ্চ বেতন নির্ধারিত নয়। নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাব তো রয়েছেই।

স্বল্প মজুরি গার্মেন্টস শ্রমিকদের অসন্তোষের অন্যতম কারণ। এই মজুরিতে ঢাকা ও এর আশেপাশের শহরে একজন শ্রমিকের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের খরচ মেটানো খুবই কষ্টকর। আবার এই স্বল্প মজুরিও পরিশোধ করতে মালিকপক্ষ প্রায়ই টালবাহানা করে। শ্রমিকদের বেতন, বোনাস ও ওভারটাইম যখন ঠিকমতো পরিশোধ করা হয় না তখনই শুরু হয় অসন্তোষ। আরেকটি কারণ হলো কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন বৈষম্য। সর্বোচ্চ বেতন সর্বনিম্ন বেতনের ২০ গুণের চেয়েও বেশি। সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারণ করা হলেও সর্বোচ্চ বেতন নির্ধারিত নয়। নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাব তো রয়েছেই। এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। তৈরি পোশাক শিল্পের বাজার ধরে রাখতে করণীয়-

১. শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে এনে সময়মতো পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে তৈরি পোশাকের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে একটি আন্তর্জাতিক ন্যূনতম বেতন স্থির করে দিতে পারে;

২. বেতন বৈষম্য কমিয়ে সর্বোচ্চ বেতন নির্ধারণ করে অর্থ সাশ্রয়ের মাধ্যমে নিম্ন বেতনভুক্তদের অধিকতর সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;

৩. কারখানার নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে প্রত্যেক কারখানা কমপ্লায়েন্স উত্তীর্ণ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে;

৪. শ্রমিকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা ও বীমাসহ সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করতে হবে;

৫. দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশের প্রায় পাঁচ হাজার পোশাক কারখানার নির্মাণ মাণ মূল্যায়ন করে ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ ও করণীয় নির্ধারণ করতে হবে;

৬. ক্ষতিপূরণ-পুনর্বাসনের বিষয়টি একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত হয়;

৭. শ্রমিক-মালিক পক্ষের সকল বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য আই.এল.ও-র কনভেনশনের ৮৭ ও ৯৮ ধারা অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ব্যবস্থা করতে হবে;

৮. গার্মেন্টস ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান ও ভবন ব্যবহারসংক্রান্ত বিধি-বিধানগুলো নতুন করে পর্যালোচনা করতে হবে।

এই শিল্পে বাংলাদেশের সফলতা, সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতি অনেক রাষ্ট্রের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্নীতির অবসান, ন্যায়পরায়ণতা, আইনের শাসন তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা না হলে এ সফলতা অব্যাহত থাকবে না। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত অঘটন এড়াতে হলে প্রয়োজন বিরাজমান সমস্যার সমাধান এবং যথাযথ আইনি ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ।

এ. এস. এম. সাদিকুর রহমান :
শিক্ষার্থী, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।
sadicps08mbstu@ymail.com

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা

সরকারি অবস্থানের প্রতিক্রিয়ায় মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশের বক্তব্য

গত ২৯ এপ্রিল ২০১৩ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ১৬তম অধিবেশনে সর্বজনীন পর্যায়বৃত্ত পূনর্বীক্ষণ পদ্ধতির (ইউপিআর) আওতায় দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনির নেতৃতে একটি প্রতিনিধিদল এই পর্যালোচনায় অংশ নেন। এছাড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ ওই অধিবেশনে যোগ দেয়। উক্ত অধিবেশনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে সরকারি অবস্থানের প্রতিক্রিয়া জানাতে মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ গত ২০ মে, ২০১৩ তারিখে ঢাকায় একটি সংবাদ সম্মেলন করে। এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত সংবাদ বিবৃতির সারসংক্ষেপ এখানে উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনার তিনঘণ্টাব্যাপী ওই আলোচনায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত চার বছরের (২০০৯-২০১২) মানবাধিকার উন্নয়নে প্রথম ইউপিআর অধিবেশনে প্রদত্ত সুপারিশ ও অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সরকারের গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম তুলে ধরেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য উপস্থাপনের পর পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় ৯৭টি দেশের প্রতিনিধিগণ আগামীতে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ১৯৬ টি সুপারিশ প্রদান করেন। সুপারিশসমূহ এসেছে মূলত - বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, শ্রমিক অধিকার ও শ্রমিকদের নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, নারী ও শিশু অধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, মানব পাচার প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধীদের অধিকার, আদিবাসীদের অধিকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষর ও সংরক্ষণ তুলে নেওয়া, মৃত্যুদণ্ড বিলোপ প্রভৃতি বিষয়ে।

এসব সুপারিশের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৬৪টি সুপারিশ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী রাজনৈতিক বিবেচনায় স্পর্শকাতর ২৫টি সুপারিশ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে সরকার সময় নিয়েছে সেপ্টেম্বরের মানবাধিকার কাউন্সিলের অধিবেশন পর্যন্ত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নির্যাতনবিরোধী সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল স্বাক্ষর, গুম বা বলপূর্বক অন্তর্ধান থেকে সব নাগরিককে সুরক্ষা দেয়া সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ বিষয়ক আইএলও'র একাধিক সনদে স্বাক্ষর, শরণার্থীদের অধিকার সংক্রান্ত সনদ এবং তার ঐচ্ছিক প্রটোকল স্বাক্ষর, নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের উপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের উন্মুক্ত আমন্ত্রণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের দ্রুত সফরের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিষয়ক সুপারিশ। অন্যদিকে ৭টি বিষয়ে সুপারিশ বাংলাদেশ সরকার প্রত্যাখান করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আঠারো বছরের কম বয়সীদের জন্য শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ড বিলোপকরণের জন্য আইন সংশোধন, মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করা এং তা বিলোপের আগ পর্যন্ত সব ফাসি বন্ধ রাখা, সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা না করা, রোহিঙ্গা শরণার্থীসহ বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে অন্যান্যদের মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমতি প্রদান প্রভৃতি।

এই সংবাদ বিবৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য জাতিসংঘে প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা ও আমাদের অবস্থান জানানো। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সরকারের কাছে যেসব সুপারিশসমূহ গ্রহণ করতে সরকার রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতার কথা বলে সময় নিচ্ছেন, সেসব সুপারিশসমূহ দ্রুত গ্রহণ করে সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার প্রদান করার জন্য আহ্বান জানাতে চাই।

কিন্তু বাস্তবতা হলো এই সংশোধনীতে আদিবাসীদের পৃথক জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, যার জন্য দীর্ঘদিন আদিবাসী নেতৃবৃন্দ ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহসহ মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ দাবি জানিয়ে আসছে।

এখানে আমরা উল্লেখ করতে চাই, বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষত খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশকিছু ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটেছে বলে আমরা মনে করি। এই অধিবেশনে বিভিন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায় বিশেষত লিঙ্গভিত্তিক সংখ্যালঘু এবং দলিত সম্প্রদায়ের অধিকারের প্রতি সরকারের সমর্থন ব্যক্ত করা ইতিবাচক বলে আমরা মনে করি।

সরকার অধিবেশনে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারপ্রক্রিয়ার অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে। ফোরাম অবশ্যই মনে করে, ১৯৭১ সালে যারা মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ করে দীর্ঘদিন ধরে বিচারের আওতামুক্ত ছিল, তাদের সেসব অপরাধের জন্য প্রচলিত আইন অনুযায়ী সুষ্ঠু বিচার ও শাস্তি হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে নির্যাতিত পক্ষ যারা দীর্ঘদিন ধরে বিচারের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে তাদের অধিকারও যাতে সংরক্ষিত হয় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মানবাধিকার ফোরাম সব পক্ষের নিকট আবেদন জানায় এই বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনীতির আওতামুক্ত রাখতে এবং বিচার প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা ধরে রাখতে।

আমাদের উদ্বেগ হলো, পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সকল নাগরিকের মানবাধিকার সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও এই সংশোধনীতে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে রেখে দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে একটি ধর্মীয় পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে অন্য ধর্মাবলম্বীদের নাগরিকবোধে আঘাত করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন– এই সংশোধনীর মাধ্যমে সকল নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীদেরকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই সংশোধনীতে আদিবাসীদের পৃথক জাতিসত্তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, যার জন্য দীর্ঘদিন আদিবাসী নেতৃবৃন্দ ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহসহ মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ দাবি জানিয়ে আসছে। ফোরাম আশা করছে ILO Convention No. 169 স্বাক্ষর করা এবং আদিবাসী নারী ও শিশুদের সকল ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে বিশেষ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে যে দুটি সুপারিশ সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে সরকার সেগুলো গ্রহণ করে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের যে অঙ্গীকার সরকার প্রদান করেছে ফোরাম আশা করে যে সরকার সে অঙ্গীকার পূরণে সুনির্দিষ্ট ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ফোরাম আরো আশা করে যে, আদিবাসীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অতি শীঘ্রই সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। দলিতদের উন্নয়নে জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করার যে সুপারিশ এসেছে সেটিও গ্রহণ করার জন্য আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, সরকার গত চার বছরে মানবাধিকার সংরক্ষণের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত ১৯৬টি আইন প্রণয়ন করেছে। আমরা এই প্রক্রিয়াকে সাধুবাদ জানাই, আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো শুধু আইন প্রণয়ন নয়, এ সংক্রান্ত বিধিমালা দ্রুত প্রণয়ন করে সরকার এই আইনগুলো কার্যকর বাস্তবায়নের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও গুমের ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল বিশেষভাবে হতাশাজনক ও অগ্রহণযোগ্য। যদিও তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার ক্ষেত্রে সরকারের "জিরো টলারেন্স" নীতি পূর্ণব্যক্ত করেন, তথাপি দেশের অভ্যন্তরে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম ও নির্যাতনের যেসব অভিযোগ রয়েছে তা বাতিল করে দিয়ে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটছে না বলে দাবি করেন। ফোরাম মনে করে তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি সত্যকে এড়িয়ে গেছেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশেষত র‍্যাব কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়ে আসছি। আমাদের দাবি, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও গুমের অভিযোগগুলো বিবেচনায় নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত যেসব সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেছে, সেগুলো দ্রুততার সাথে সম্পাদন করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হোক। এছাড়া আমরা আশা করি নির্যাতন বিরোধী সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল এবং

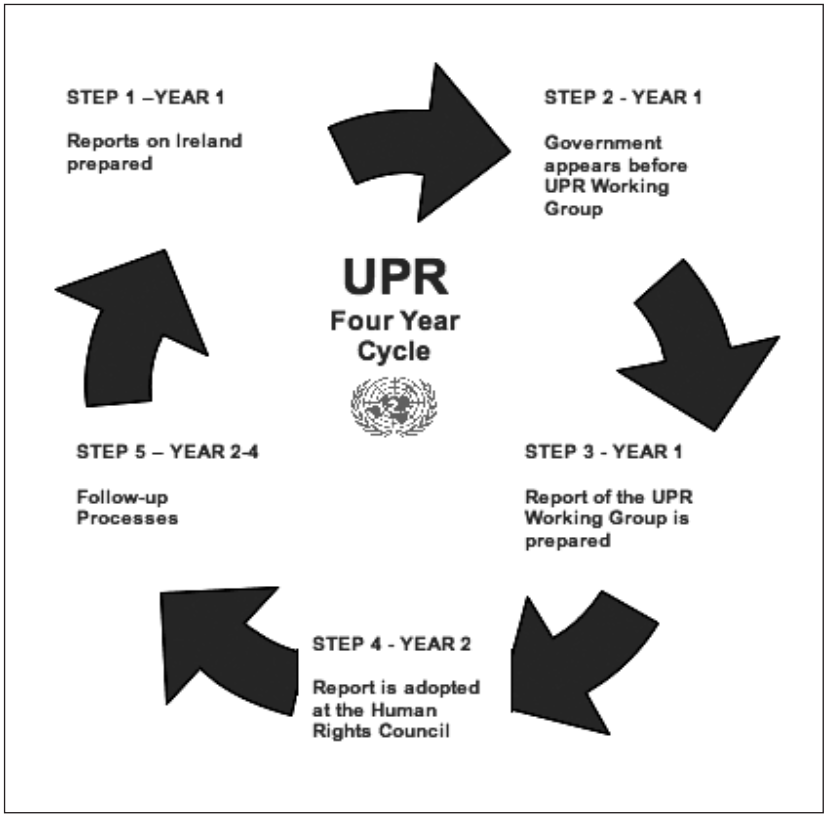

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম ও নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন সংক্রান্ত যেসব সুপারিশ সরকার বিবেচনাধীন রেখেছে তা তারা দ্রুত গ্রহণ করে নেবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সরকারের অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে রামুর ঘটনা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর রায়ের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে ধরনের নির্যাতন চালানো হয়েছে তা প্রতিরোধে সরকার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে এবং পরবর্তীতে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানে সরকার অগ্রীম সতর্কতা অবলম্বন করে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করবে বলে ফোরাম আশা করে।

সাভার ট্র্যাডেজির মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে এই পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই এ ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। মানবাধিকার কাউন্সিলের সভাপতিসহ অন্যান্য দেশসমূহ তাদের বক্তব্যের শুরুতে গভীর সমবেদনা জানান এবং বিভিন্ন দেশ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ এবং শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ বিষয়ক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করে। তৈরি পোশাক ও কুটির শিল্পের শ্রমিকদের সর্বোচ্চ আইনি ও পেশাগত সুরক্ষা প্রদান সংক্রান্ত সুপারিশ ব্যতিরেকে বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য সুপারিশসমূহ গ্রহণ করেছে। আমরা আশা করছি এই সুপারিশটিও সরকার দ্রুত গ্রহণ করে নেবে এবং এসব সুপারিশ বাস্তবে প্রয়োগের জন্য যে যে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা আসবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি মানবাধিকার উন্নয়নে/ সুরক্ষায় তাঁর বক্তব্যে সরকারের কাজের যে মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন তার অনেক দিক নিয়ে আমাদের দ্বিমত রয়েছে। মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ মনে করে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে উদ্বেগসমূহ বিরাজ করছে সেগুলো দূর করতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অস্বীকার করার প্রবণতা পরিহার করা উচিত। বরং বাস্তবতাকে স্বীকার করে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে। কেননা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সংবিধানের বাধ্যবাধকতা, আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং বর্তমান মহাজোট সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহ- সবক্ষেত্রে এসব মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং রক্ষার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

আমাদের আহ্বান হলো, যে সুপারিশসমূহ সরকার গ্রহণ করেছে কেবল মৌখিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমিত না রেখে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখপূর্বক দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবভিত্তিক, দৃশ্যমান ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে সরকার। আমরা আরো আশা করবো যে, যেসব সুপারিশ সরকার বিবেচনাধীন রেখেছে সেগুলো গ্রহণ করে বাস্তবায়নের জন্যও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আর সার্বিকভাবে এই কর্মপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারক করতে সরকারের পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করার সুপারিশ জানাই আমরা। আমরা এই প্রক্রিয়াতে নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা বাড়ানোরও আহ্বান জানাই। মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ সরকারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করবে এবং এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যবেক্ষণ করে যাবে। প্রতিবছর আমরা সরকার এসব অঙ্গীকার কতটুকু বাস্তবায়ন করছে তার উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করবো।

(এই বিবৃতিটি সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করেন ফোরামের আহ্বায়ক এ্যাড. সুলতানা কামাল।)

তিস্তার পানি নিয়ে অনিশ্চিত আলোচনা

আলতাফ পারভেজ

যদিও দুটি দেশের সরকারই এ মুহূর্তে গভীর বন্ধুত্বের অভিনয় করছে কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের অমীমাংসিত সমস্যা বহু। বিশেষ করে তিস্তা নদীর পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান করতে না পেরে শেখ হাসিনা ও মনমোহন সিংয়ের সরকার প্রকৃতই কূটনীতিক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বাংলাদেশের ব্যর্থতার পাল্লা এক্ষেত্রে বেশি ভারী। কারণ তিস্তায় পানি পাওয়া যাবে এই আশায় সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতকে করিডর সুবিধাসহ তার চাহিদামতো অন্যান্য সকল সুবিধাই একতরফাভাবে দিয়েছে। কিন্তু মনমোহনের সফরকালে চূড়ান্ত মুহূর্তে ভারত তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষর না করে পিছু হটে যায়।

বাংলাদেশ ও ভারত জুড়ে ৫৪টি নদীর প্রবাহ থাকলেও গত ৪০ বছরে কেবল একটি নদী (গঙ্গা)-এর পানি নিয়ে দুই দেশ ৩০ বছর মেয়াদি সমঝোতায় পৌঁছতে পেরেছে।

অথচ ১৯৭২ সাল থেকে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পানি বিষয়ক আলাপ-আলোচনা চলছে, যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকও হয়েছে ৩৮ দফা। কিন্তু ফলাফল প্রায় শূন্য, প্রাপ্তিও সামান্য। দুই সরকারের মেয়াদও প্রায় শেষ। অথচ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গত ৫০ বছরের অভিজ্ঞতা হলো নদী বিষয়ক ২০০টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে। একই সময়ে পানি নিয়ে অন্তত পাঁচ শত দফা সংঘাতের বিপরীতে সহযোগিতার ঘটনা ঘটেছে সহস্রাধিক।

কেবল পানি প্রাপ্তিতে ব্যর্থতাই নয়– পানি বণ্টন আলোচনায় কূটনৈতিক বিবেচনায়ও বাংলাদেশ সম্প্রতি বেশ পিছু হটে গেছে। এতদিন সমঝোতায় পৌঁছতে না পারলেও দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় পানির সংকটই থাকতো এক নম্বর বিষয়। সেই অগ্রাধিকার এখন পাল্টে গেছে। আলোচনার টেবিলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয় হয়ে উঠেছে ট্রানজিট ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গ– যাতে বাংলাদেশের সরাসরি কোন স্বার্থ জড়িত নেই।

দু'দেশের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে গত ৫ বছরের বৈঠকগুলো অনুসরণ করলে দেখা যায়, সিদ্ধান্ত যা হচ্ছে তার সবই ট্রানজিট ও নিরাপত্তা বিষয়ে, আর পরবর্তী এজেন্ডাগুলোর ক্ষেত্রে (যেমন- পানি, বাণিজ্য ইত্যাদি) কেবল 'আশাবাদ' ব্যক্ত করা হচ্ছে– কূটনীতির ভাষায় যা কেবল একটি শূন্যগর্ভ শব্দ মাত্র।

২০১০ সালে শেখ হাসিনার সফরকালে বাংলাদেশ-ভারত যে যৌথ ঘোষণা প্রচারিত হয় তাতে তিস্তার পানি বণ্টনের বিষয়টি ২৭তম অনুচ্ছেদে স্থান পায়! গত দুই দশক ধরে ভারত চেষ্টা করছিল 'পানির বিনিময়ে করিডোর' সুবিধা আদায় করে নিতে। অতীতে গণমাধ্যমে এরূপ 'প্যাকেজ ডিল'-এর কথা শোনা যেত। এখন বাস্তবতা এমন দাঁড়িয়েছে ভারত 'জল না দিয়েই করিডোর' সুবিধা পেয়ে গেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাপকদের মাঝে এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই যে, আশুগঞ্জ দিয়ে সম্প্রতি ভারতীয়রা যেভাবে তাদের 'হেভি ভেইকল' পরিবহন করছে তা পুরোদস্তুর করিডোর ব্যবস্থা মাত্র।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত পানি বিষয়ে একমাত্র চুক্তি হয়ে কেবল গঙ্গার পানি নিয়ে। ১৯৯৬-২০০১ সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় এ বিষয়ে সর্বশেষ চুক্তি হয়। সেই ইতিহাসের আলোকেই কূটনীতিবিদরা ভেবেছিলেন, পানি আলোচনায় এবারের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও বোধহয় এক ধাপ অগ্রগতি ঘটবে, বিশেষত তিস্তার পানি নিয়ে। কিন্তু ২০১০ সালে শেখ হাসিনার ভারত সফর এবং ২০১১ সালে মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরের পরও এইরূপ কোন চুক্তি না হওয়ায় এখন স্পষ্ট, অভিন্ন নদীগুলোর পানিতে ভারত বাংলাদেশকে আর কোনোভাবে অধিকারের স্বীকৃতি দিতে চায় না। করিডররূপী ট্রানজিট সুবিধা পাওয়ার পরও ভারতের এই মনোভাবে বাংলাদেশের মানুষ প্রচণ্ডভাবে আশাহত।

শেখ হাসিনার ভারত সফরের পর বলা হয়েছিল, 'ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে

মনমোহন সিংয়ের সফরের পর আশাহত দেশবাসীকে অর্থমন্ত্রী মুহিত আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'আগামী তিন মাসের মধ্যে তিস্তার পানি বন্টন বিষয়ে চুক্তি হবে।' সেই তিন মাস মেয়াদও পেরিয়ে গেছে বহুদিন হলো।

সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু হলো।' কিন্তু সেই 'নতুন অধ্যায়ে'ও পানি বিষয়ক ন্যায্য হিস্যা না পাওয়ায় দেশজুড়ে তীব্র হতাশা তৈরি হয়েছে। মনমোহন সিংয়ের সফরের পর আশাহত দেশবাসীকে অর্থমন্ত্রী মুহিত আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'আগামী তিন মাসের মধ্যে তিস্তার পানি বন্টন বিষয়ে চুক্তি হবে।' সেই তিন মাস মেয়াদও পেরিয়ে গেছে বহুদিন হলো।

জনগণের সঙ্গে নীতিনির্ধারকদের তামাশা অবশ্য আরো বহুভাবে বহাল আছে। যেমন- মনমোহনের সফরের সময় বলা হয় বাংলাদেশকে ৪৬টি পণ্যে ভারত নতুন করে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে। কিন্তু পরে ব্যবসায়ীরা জানালেন, ঐ ৪৬টি পণ্যের মধ্যে বাংলাদেশ ১২ পণ্য উৎপাদনই করে না।

কূটনীতিক সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সালেই বাংলাদেশ সরকার তিস্তার পানির বিষয়ে সম্ভাব্য একটি চুক্তির খসড়া ভারতীয়দের কাছে জমা দিয়েছিল। ভারতের পানি সম্পদমন্ত্রী পাওয়ান কুমারও একই বিষয়ে তাদের তরফ থেকে সম্ভাব্য চুক্তির একটি খসড়া উপস্থাপন করেছে। দুদেশের কোনো সরকারই পেশকৃত চুক্তিগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু বলছে না। তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের একটি অংশ বাংলাদেশকে তিস্তার প্রবাহের ৪৮ শতাংশ পানি দিতে চাইলেও অপর অংশ চূড়ান্ত পর্যায়ে তাতে আপত্তি তোলে এবং শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে আপত্তিকারীদেরই জয় হয়।

তিস্তা: পানি ও প্রবাহ

প্রায় ২৪৬ মাইল দীর্ঘ তিস্তার উৎপত্তি উত্তর সিকিমে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫ হাজার ৩০০ মিটার উঁচুতে। বাংলাদেশ-ভারত আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোর মধ্যে তিস্তা বেশ খরস্রোতা। নীলফামারী দিয়ে এদেশে ঢুকে কুড়িগ্রামে যমুনার সঙ্গে মিশে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিস্তা প্রায় ৮৩ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে।

বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশে তিস্তার প্রবাহ কখনো কখনো কমে দাঁড়ায় মাত্র ৪-৫ শত কিউসেকে (কিউসেক = প্রতি সেকেন্ডে এক ঘন ফুট)। গত তিন বছরের পরিস্থিতি অনুসন্ধান করে দেখা যায়, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে নীলফামারীর ডিমলায় তিস্তায় পানি প্রবাহ ছিল মাত্র নয় শত কিউসেক। [দৈনিক যুগান্তর, ০১.০৩.২০১১] । সীমান্তের প্রায় ৫০ মাইল উজানে গজলডোবায় নির্মিত ২১১.৫৩ মিটারের একটি ব্যারাজের মাধ্যমে একপাক্ষিক পানি প্রত্যাহারের কারণেই এই দুঃসহ অবস্থা।

গজলডোবার এই ব্যারেজের দুটি সেচ খালের মাধ্যমে ২০ হাজার কিউসেক পানি প্রত্যাহার করে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে প্রায় দশ লাখ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে। ১৯৮৭ সাল থেকে এইভাবে পানি প্রত্যাহার চলছে। ব্যারাজ নির্মাণের পূর্বে সর্বনিম্ন পানি-প্রবাহ ছিল ন্যূনতম চার হাজার কিউসেক।

নীলফামারীতে ১৯৯০ সালে ১৫ শত কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্পটি পানির অভাবে অকার্যকর হয়ে থাকলেও সীমান্তের ওপারে তিস্তার পানি নিয়ে ভারত জলপাইগুড়িতে ৬১ হাজার, দার্জিলিংয়ে ১৭ হাজার, মালদহে ৩৮ হাজার, দিনাজপুরে ২ লাখ ৪ হাজার একরসহ সর্বমোট ৩ লাখ ২০ হাজার একর জমিতে সেচ প্রদান করছে নিয়মিত।

উল্লেখ্য, নীলফামারীতে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সরকার সেচ প্রকল্প নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া মাত্রই ভারত গজলডোবায় ব্যারাজ নির্মাণের কাজে হাত দেয় এবং মাত্র দু'বছরে তার কাজ সমাপ্ত করে ফেলে। আর বাংলাদেশ তার সেচ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করতেই সাত বছর সময় নেয়। তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প থেকে পাঁচ লাখ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা দেয়ার পরিকল্পনা ছিল সরকারের। কিন্তু এখন কার্যত ৪০-৫০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের পানি দেয়া যাচ্ছে। প্রকল্পের কেবল প্রথম পর্যায়ের এক লাখ ১০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের জন্য পাঁচ হাজার কিউসেক পানি দরকার। কিন্তু সর্বোচ্চ পাওয়া যায় দুই-আড়াই হাজার কিউসেক। এটাও আবার অনেক সময় কমে যায়। তখন কৃষক গভীর নলকূপ থেকে পানি তোলে। তার জন্য বিঘা প্রতি ধান আবাদের খরচ বেড়ে যায় ৩-৪ হাজার টাকা। অথচ তিস্তার পানির জন্য দিতে হয় বিঘা প্রতি ১৬০ টাকা। এই হিসাব থেকে দেখা যায়, কেবল তিস্তার পানি বঞ্চনার মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকের শত শত কোটি টাকা ক্ষতির কারণ হয়েছে।

যেহেতু আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ভাটিতে সে কারণে কোন ধরনের চুক্তি না থাকলে শুষ্ক মৌসুমে সম্ভাব্য প্রবাহ সম্পর্কে কৃষকরা কোনো অনুমান করতে পারে না এবং সে কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ পাড়ের নদী অববাহিকায় চাষাবাদ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। উপরন্ত প্রতিটি নদী অববাহিকায় জনসংখ্যা বাড়ায় পানির চাহিদাও বাড়ছে। অববাহিকা অঞ্চলে জনসংখ্যা ও কৃষি জমির চাহিদা বিবেচনায় পানি প্রাপ্তির যে অধিকার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃত। বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুরের মানুষের ভাগ্যে তা জোটেনি কখনো। ফলে পানিশূন্য পদ্মা পাড়ের মানুষদের মতো তিস্তা পাড়ের মানুষরাও এখন প্রায় পুরোপুরি ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আর সেখানেও ক্রমে নামছে পানির স্তর এবং

তাতে মিলছে জীবনবিনাশী নানা জৈব উপাদান। এর ফলে আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোর বিপন্নতা পরোক্ষে বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রামে সৃষ্টি করছে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত নয়া এক দুর্যোগ।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এতদিন পানির আলোচনায় পানির পরিমাণ নিয়েই আলোচকরা ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু নদী অববাহিকার চাষীরা, বিশেষত রংপুর অঞ্চলের মানুষ চাচ্ছেন আলোচনার টেবিলে পানির গুণগত দিকটিকেও গুরুত্ব দেয়া হোক। কারণ সীমান্তের ওপারে নদীর দু'পাড়ে যেভাবে শিল্প কারখানা বসছে এবং নদীর পানি দূষণ হচ্ছে তাতে ভাটিতে সেই পানি বেশি পরিমাণে পেলেও কোনো লাভ হবে না; কোনো ধরনের ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকবে না তার। অভিন্ন নদীগুলোর পানির গুণগত মান রক্ষায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর আন্তর্জাতিক যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে সে বিষয়েও যাতে ঐক্যমত হয় সাধারণ পানি ব্যবহারকারীরা সেটাই চাচ্ছেন। এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক যেসব ম্যাকানিজম রয়েছে তার আলোকেই ভারতের ক্ষেত্রে অনেক বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

পানির হিস্যা নিয়ে দরকষাকষি

১৯৭২ সাল থেকেই তিস্তার পানি নিয়ে আলোচনা ও দরকষাকষি চলছে। যৌথ নদী কমিশনের ২০তম বৈঠকে একবার ঐকমত্য হয়েছিল, তিস্তার পানির হিস্যা ভারত পাবে ৪০ ভাগ, বাংলাদেশ পাবে ৪০ ভাগ এবং বাকি ২০ ভাগ রিজার্ভ থাকবে। ১৯৮৩ সালে প্রায় অনুরূপ বণ্টন মেনে একদফা এডহক চুক্তিতেও সম্মত হয় দু'পক্ষ। সেই প্রক্রিয়াও কিছু দিন পরই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ এরূপ বণ্টনে এখনো অবিচল থাকলেও ভারত এখন চাচ্ছে পুরো প্রবাহই বণ্টিত হয়ে যাক। অর্থাৎ তারা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের জন্য কোন পানিই অবশিষ্ট রাখতে চাচ্ছে না। বর্তমান সরকার তাতেও সম্মত ছিল, কিন্তু তারপরও ভারত কোন চুক্তিতে উপনীত হতে অনিচ্ছুক থেকেছে।

লক্ষ্য করা গেছে, পানির আলোচনা যত প্রলম্বিত হয় ততই উজানের দেশ লাভবান হয়। সে কারণেই ১৯৯৬ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার যখন গঙ্গার পানি নিয়ে চুক্তি করে তখন সেই চুক্তির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষ তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে ১৯৭৭ সালে সম্পাদিত পাঁচ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি চুক্তি যতটা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে দ্বিতীয় চুক্তিটি সেভাবে হয়নি, হচ্ছে না। কারণ শেষোক্ত চুক্তিতে পানির হিস্যা বিষয়ে সমঝোতা হলেও সেই পানি পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা (গ্যারান্টি কজ) ছিল না এবং বাংলাদেশ চুক্তিমত পানি পাচ্ছে কি না তার নজরদারিতে যৌথ নদী কমিশনের কর্তৃত্বও স্বীকৃত হয়নি। অন্যদিকে, ১৯৭৭ সালের চুক্তির পটভূমি তৈরি করেছিল মাওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক 'ফারাক্কা মার্চ।' কিন্তু ১৯৯৬ সালে বা এখন ভারতীয় পানি প্রত্যাহারের কোন রাজনৈতিক প্রতিবাদ না থাকায় আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক অঙ্গনেও ভারতীয়দের কোনরূপ জবাবদিহিতার মধ্যে পড়তে হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের পর সরকারের একটি মহল বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমকে ধারণা দিয়েছিল, তিস্তার পানি বিষয়ে সমঝোতা প্রলম্বিত হওয়ার কারণেই বাংলাদেশে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরও বিলম্বিত হচ্ছে। মনমোহনের সফরে পানিচুক্তি হবেই। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। যদিও প্রাথমিক ঐক্যমত হয়েছিল, তিস্তা নিয়ে চুক্তির মেয়াদ হবে ১৫ বছর এবং চুক্তিটি হবে আপতকালীন। এরূপ একটি চুক্তির মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে রংপুর অঞ্চলের সাড়ে সাত লাখ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা বাড়বে। অন্যদিকে, গঙ্গার পর যদি তিস্তার পানি নিয়েও চুক্তি করা যায় তা হলে অভিন্ন অন্যান্য নদী নিয়ে আলোচনা দ্রুত এগোবে, কারণ তখন এরূপ চুক্তিগুলোকে নমুনা হিসেবে ধরে এগোনো সহজ হতো। ভারতীয়রা ঠিক এটাই চাচ্ছে না। 'গঙ্গা ও তিস্তার পানি নিয়ে একটি বণ্টন মানদণ্ড দাঁড়িয়ে গেলে বাংলাদেশকে অন্যান্য নদীর পানিও ঐভাবে দিতে হবে'– এইরূপ একটি আশংকা থেকে ভারতীয়রা এখন আর পানি আলোচনায় এগোতে অনিচ্ছুক। যদিও পানির লোভ দেখিয়ে করিডরসহ অন্যান্য সুবিধা নিতে বিলম্ব ঘটেনি তাদের।

তিস্তার পানি বণ্টন ছাড়াও বাংলাদেশের তরফ থেকে বন্যা পূর্বাভাসের ক্ষেত্রেও উভয় দেশের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ চাচ্ছে অভিন্ন নদীগুলোর উজানে পানি বৃদ্ধির খবর বাংলাদেশ যেন অন্তত ৫৫-৬০ ঘণ্টা পূর্বেই পায়। ভারত এত পূর্বে সতর্কীকরণ বার্তা প্রেরণে অনাগ্রহী। যদিও নেপালের সঙ্গে সে অনুরূপ চুক্তি করে রেখেছে– যেখানে, নেপালের অভ্যন্তরে অন্তত ৪২টি স্থানে ১৯৮৯ সাল থেকে নদীর পানির হ্রাস-বৃদ্ধি নজরদারি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ-ভারত যে পানি চুক্তি হয় তার নয় নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উভয় দেশ 'সমতা, স্বচ্ছতা ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি করতে একমত পোষণ' করেছিল। কিন্ত গঙ্গা চুক্তি যে ভারত ঠিক মতো অনুশীলন করতে ইচ্ছুক নয় তার প্রমাণ হিসেবেই বলা যায়, ঐ চুক্তি স্বাক্ষরের দেড় দশক পরও আর একটি নদীর পানি নিয়েও চুক্তিতে এগোনো যায় নি।

বাংলাদেশকে তার ন্যায্য পানি দিতে কুণ্ঠিত থাকলেও বিগত সময়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু নদী নিয়ে (১৯৬০) এবং নেপালের সঙ্গে মহাকালি ও কোশি নদীর প্রবাহ নিয়ে (১৯৯৬) ভারত সন্তোষজনক চুক্তিতে উপনীত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকও ক্ষেত্র বিশেষে কারিগরী সহায়তা দিয়েছে। নেপালে বুড়ি গান্ধকী হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রকল্পেও ভারত সর্বোতভাবে সম্পৃক্ত। প্রায় ৮৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদনের সুযোগ তৈরি করে নিয়েছে ভারত নেপালের নদীগুলোতে। বাংলাদেশ যখন হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রকল্পের কাজ

নানা ধরনের ব্যারাজ ও ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভারত ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশে মরুকরণ উস্কে দিলেও চীন যখন ব্রহ্মপুত্রে ব্যারাজ নির্মাণের কাজে হাত দেয় তখন ভারত প্রচন্ড প্রতিবাদী হয়ে উঠে।

ত্রিপক্ষীয় ভিত্তিতে শুরুর প্রস্তাব করেছিল তখন ভারত রাজি হয়নি, অথচ এখন সেই বিদ্যুতই বাংলাদেশে বিক্রির আয়োজন চলছে বাংলাদেশের সম্মতিতেই।

গত বছর শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে বাংলাদেশের মানুষকে এমনভাবে ধারণা দেয়া হয়েছিল, ট্রানজিটের বিনিময়ে কেবল জল নয়– ভারত আমাদের বিদ্যুতও দেবে। কিন্তু ২০১১-এর ফেব্রুয়ারিতে ভারত এ সংক্রান্ত যে খসড়া চুক্তিপত্র পাঠিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, দেশটি ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুত দিতে চায় 'সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, দাম নির্ধারণ ও বাড়ানো এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সুদ আরোপের ক্ষমতা' নিজের হাতে রেখে। ভারতের সেন্ট্রাল এনার্জি রেগুলেটারি কমিশন সময় সময় বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করবে। উপরন্ত বছরে চার দফায় এই দাম পরিশোধ করতে হবে অগ্রিম ভিত্তিতে। আরো বিস্ময়কর হলো, এই বিদ্যুত পণ্যটি ভারত রফতানি করলেও এর পরিবহন ব্যয় এবং পরিবহনকালীন যাবতীয় ঝুঁকি বহন করবে ক্রেতা বাংলাদেশ! বিশ্ব পণ্য বাজারে বর্তমানে বিক্রেতার এত শক্তিশালী অবস্থান খুব সচরাচর দেখা যায় না। এরকম এক বাণিজ্যিক প্রতিপক্ষের সঙ্গেই বাংলাদেশকে 'পানি সহযোগিতা'র জন্য লড়তে হচ্ছে দশকের পর দশক ধরে।

পানির লড়াই যখন আঞ্চলিক পরিসরে

নিজের অযৌক্তিক অবস্থান আড়ালে রাখতেই এইরূপ আলোচনায় তৃতীয় কারোর অন্তর্ভুক্তিতে ভারতের বরাবর আপত্তি। সকলের সঙ্গে এই ইস্যুতে সে দ্বিপাক্ষিক পদ্ধতি অনুসরণ করে মূলত একেক দেশ থেকে একেক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য। যেমন- বাংলাদেশের সঙ্গে পানি আলোচনায় তৃতীয় কাউকে অন্তর্ভুক্তিতে সম্মতি না থাকলেও ট্রানজিট বিষয়ে এডিবি ও বিশ্বব্যাংককে অন্তর্ভুক্ত করতে খুবই আগ্রহী সে। তবে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পাকিস্তানের সঙ্গে ছয়টি নদী নিয়ে ভারতের যে 'সিন্ধু নদী চুক্তি' হয়েছে সেখানেও শেষোক্ত দেশটি চুক্তি লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত। চুক্তি অনুযায়ী ভারত অভিন্ন নদীগুলোতে মানব সৃষ্ট কোনো কাঠামো নির্মাণ করতে পারবে না। কিন্তু ঝিলাম নদীতে সে সম্প্রতি 'নেভিগেশন প্রজেক্ট'-এর কাঠামো গড়ে তুলেছে।

ভারতের এইরূপ 'প্রজেক্ট' পাকিস্তান কর্তৃক ব্যাপক প্রতিবাদের জন্ম দিলেও বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত নদীগুলোতে যখন হামেশা এসব মানব সৃষ্ট কাঠামো গড়ে উঠছে তখন আমাদের সরকার, সিভিল সোসাইটি এবং পানি বিশেষজ্ঞরা থাকছেন নিশ্চুপ। গঙ্গা নদীটি বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশের আগেই অন্তত সাতটি স্থানে (পঞ্চেশ্বর, তানকপুর, গিরিজপুর, গন্ধক, কোশি, সপ্ত এবং ফারাক্কা) ড্যাম বা ব্যারাজ তৈরি করে পানি প্রত্যাহার করা হচ্ছে তা থেকে। অথচ বাংলাদেশের প্রায় চার কোটি মানুষ গঙ্গা বেসিনে পানির অপেক্ষায় থাকে।

দক্ষিণ এশিয়ায় পানি কূটনীতির একটি কৌতুককর দিক হলো নানা ধরনের ব্যারাজ ও ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভারত ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশে মরুকরণ উস্কে দিলেও চীন যখন ব্রহ্মপুত্রে ব্যারাজ নির্মাণের কাজে হাত দেয় তখন ভারত প্রচণ্ড প্রতিবাদী হয়ে উঠে। প্রসঙ্গক্রমে এও উল্লেখ্য, জাতিসংঘের (১৯৯৭ সালের ২১ মে-তে সাধারণ পরিষদে গৃহীত) 'কনভেনশন অন দ্য ল' অব দ্য নন-নেভিগেশনাল ইউজেজ অব ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারকোর্সেস' অনুযায়ী আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারে তিনটি প্রধান বাধ্যবাধকতা রয়েছে: সংশ্লিষ্ট সকলের সমানাধিকার মেনে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ঐ পানি ব্যবহার করতে হবে; নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের কোনো ক্ষতি করা যাবে না এবং নদীতে কোনো প্রকল্প চালাতে হলে তা অববাহিকার সকল দেশকে অবহিত করতে হবে। বাংলাদেশে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীগুলোর ক্ষেত্রে উজানের দেশগুলো বারবার উপরোক্ত কনভেনশন লঙ্ঘন করছে– অথচ আমাদের দেশে সে সম্পর্কে সচেতনতা নেই। এমনকি সম্ভাব্য তিস্তা চুক্তিতেও জলপাইগুড়ির গজলডোবা কিংবা অন্যত্র তিস্তায় ভারত যে ব্যারাজ কিংবা বাধ নির্মাণ করছে সে বিষয়ে প্রতিকারমূলক কিছু যে থাকছে না সেটা নিশ্চিত করছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যৌথ নদী কমিশনের সদস্যরা।

তিস্তার মৃত্যু: বাংলাদেশ যখন নীরব

তিস্তা অববাহিকার বর্তমান ও ভবিষ্যতের এতসব বিপন্নতার কথা অত্র অঞ্চলের কোনো জনপ্রতিনিধি সাম্প্রতিক সময়ে কখনো জাতীয় সংসদে তুলে ধরেছেন বলে দেখা যায় নি। ঐ এলাকার বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদরা বা জাতীয় পর্যায়ে তাদের দলও এক্ষেত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো ভূমিকা রেখেছে বলে দেখা যায় না। এমনকি জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশবাদী যেসব সংগঠন সক্রিয় তারাও বৃহত্তর রংপুরের চলমান মরুকরণে নীরব। ভারতের কাছ থেকে ন্যায্য কিছু পাওয়ার প্রশ্ন এলেই নানা গোত্র এবং ছদ্ম অবস্থানে থাকা বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী এরূপ ভূমিকা নেয়। বরাবর তারা দেশীয় স্বার্থের চেয়ে ভারতের স্বার্থের পক্ষে থাকাই যথার্থ কর্তব্য মনে করে। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে দেশীয় শাসকশ্রেণীর মৈত্রীর দিকটি স্পষ্ট। কিন্তু জনগণ তাদের এই ভূমিকা কতটা আমলে নিতে পেরেছে সেটা অস্পষ্ট।

আলতাফ পারভেজ : লেখক ও গবেষক।
altafparvez@yahoo.com

পাওয়া

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের
নারী শ্রমজীবীদের একটি
বাণিজ্যিক উদ্যোগ

দেশীয় কাপড়ের বুটিক, ব্লক-বাটিক ও কারচুপির থ্রী-পিছ, শাড়ী, ফতুয়া, বেডসীট ও পর্দা ক্রয়ের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

দোকান নং ৬০-৬১, টাউন হল সুপার মার্কেট (কাঁচা বাজারের উপরে), মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: ০১৭৫৩৭০১২৩৯, ই-মেইল: pawafabrics@gmail.com

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

নাগরিক উদ্যোগ
সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

অবস্থান	আকার	রঙিন/সাদা-কালো	মূল্য
ব্যাক পেজ	পূর্ণ পৃষ্ঠা	রঙিন	২৫,০০০/-
ব্যাক পেজ	অর্ধ-পৃষ্ঠা	রঙিন	১৩,০০০/-
কাভার পেজ ইনার	পূর্ণ পৃষ্ঠা	রঙিন	২০,০০০/-
কাভার পেজ ইনার	অর্ধ-পৃষ্ঠা	রঙিন	১০,০০০/-
ব্যাক পেজ ইনার	পূর্ণ পৃষ্ঠা	রঙিন	১৫,০০০/-
ব্যাক পেজ ইনার	অর্ধ-পৃষ্ঠা	রঙিন	৮,০০০/-
ভেতরের পৃষ্ঠা	পূর্ণ পৃষ্ঠা	সাদা-কালো	১০,০০০/-
ভেতরের পৃষ্ঠা	অর্ধ-পৃষ্ঠা	সাদা-কালো	৬,০০০/-

গার্মেন্ট কারখানার নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চত করুন, কারখানা থেকে গোডাউন আলাদা রাখুন।

- বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম